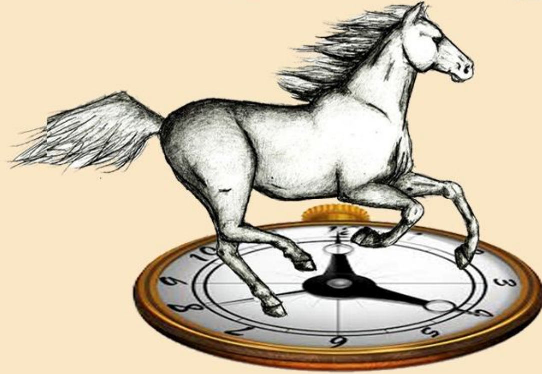
কল্পিত বিজ্ঞান

বিবর্তনবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন







শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রকাশ কালঃ

সেপ্টেম্বর- ২০১৪ ইং।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ

মুসলিম ফটোস্ট্যাট এন্ড কম্পিউটিং
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১৪৪-১২১৪, ০১৭৬১-৮৫৩২৫৪।

এক.

বাড়ি ফিরতেই শহিদের বাবা চিৎকার করে উঠলেন,

- আবারও বিজ্ঞানে ফেল করেছিস?

শহিদ চুপ করে থাকে। এটা উত্তর দেওয়ার মতো কোনো প্রশ্ন নয়। উত্তর নেওয়ার জন্য প্রশ্নটি করাও হয়নি। তাকে নিরব দেখে রহিম সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন,

- পড়াশুনা ভালো না লাগলে গরুর ঘাস কাঁটতে হবে, বুঝেছো?

শহিদ এবারও চুপ থাকে। ঘাস কাঁটা কোনো কঠিন বিষয় নয় তবে শহর এলাকাতে ঘাস পাওয়াটাই হলো আসল কথা। তাছাড়া ঘাস কাঁটার মধ্যে তেমন কোনো সমস্য আছে বলে মনে হয় না শহিদের কাছে। তার বাবাও প্রায়ই ঘাস কাঁটেন। বাড়ির পাশে যে ফুল বাগানটি রয়েছে, সেটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজটি তিনি নিজে হাতেই করেন। তার এ ঘাস কাঁটা অবশ্য গরুর জন্য নয়, কিন্তু ঘাস কাঁটলে যদি সম্মান নষ্ট না হয় তবে কাঁটার পর গরুতে খেলেই বা কি?

শহিদকে নিরব দেখে তার বাবা রাগে গজগজ করতে করতে প্রস্থান করেন। বাকি রাগটুকু তিনি শহিদের মার উপর ঢালবেন।

ছেলের ধারাবাহিক ব্যার্থতায় শহিদের মাও যে রাগান্বিত হন নি তা নয় তবু মা বলে কথা! পুরুষ মানুষ রেগে গেলে তাকে সামলানো মেয়েদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শহিদের মা নিপুনভাবেই দায়িত্বটি পালন করেন। রহিম সাহেব যখনই শহিদকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন সাদিয়া আক্তার তাতে বাঁধ সেঁধে বলেন,

- এসব হেয়ালী রেখে কাজের কাজ করো। একটা ভালো শিক্ষকের নিকট পড়ালে তো আর সে রেজাল্ট খারাপ করতো না!

শহিদের মা কথাটি প্রায়ই বলেন, কিন্তু ভাল শিক্ষক বলতে কি বোঝায় রহিম সাহেব এখনও তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। গত দু' বছরে ডজন কয়েক টিউটরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ভাল বেতনের লোভে তারাও আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। একের পর এক শিক্ষক বদলানো হয়েছে কিন্তু শহিদের পরীক্ষার ফলাফল বদলায় নি। উল্টো শিক্ষকদেরই দীক্ষা দিয়ে ছেড়েছে। পাঠ্য বইয়ের বাইরের যত প্রশ্ন শহিদের মাথায় গিজগিজ করে। তার দু'একটি ছুঁড়ে দিলেই শিক্ষক মণ্ডলী কুপোকাত হয়ে যায়। এরপর মহাপন্ডিতের মতো শহিদ সেসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে

বাজিমাত করে দেয়। কে যে কাকে পড়াচ্ছে তা বুঝে নেওয়াই দুষ্কর। শিক্ষকদের বেশিরভাগই প্রথম মাসের বেতন হস্তগত করার পরই লা-পাত্তা হয়ে গেছে। দু'একজন তো মাস শেষ হওয়ার আগেই ইস্তোফা দিয়েছে। ব্যাতিক্রম কেবল কদম আলী মাস্টার। তিনি বয়স্ক মানুষ। ত্রিশ বছরের অধিক সময় ধরে সোনাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। পোলাপানের কাছে হার মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কদম আলী মাস্টারের একটি ব্যাতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন বই-পুস্তক পাঠ করেন। তাই শহিদের প্রশ্ন-উত্তরের সাথে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন। এই যোগ্যতাটির কারণে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়েও গত কয়েক মাস ধরে শহিদের শিক্ষক হিসেবে বহাল তবিয়তেই টিকে আছেন। সেই সুবাধে বেশ কিছু টাকাও তার পকেটস্থ হয়েছে। কিন্তু টিকে থাকাটা এখন তার জন্য কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। পড়িয়ে যদি ছাত্রকে পাশই করাতে না পারেন তবে কি আর শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা হয়! সেদিন রাতে গ্রহান্তরে যুদ্ধ নামে একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বগলদাবা করে শহিদের বাড়ি পৌঁছালে শহিদের বাবা তার সাথে দেখা করে বললেন,

- আপনার ছাত্র তো আবারও ডাব্বা মেরেছে!

শহিদের বাবা নিজ দায়িত্বে খবরটি সরবরাহ করা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কদম আলী স্যার নিজেই ছাত্রকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারতেন। কিন্তু মাসে মাসে অতগুলো টাকা যার পকেটে ঢালছেন তাকে একটু অতিরিক্ত লজ্জা দেওয়ার জন্যই এই আয়োজন।

কদম আলী মাস্টার কিন্তু খুব বেশি অবাক হলো হলেন না। শহিদের কাছ থেকে এধরণের একটি ফলাফলই তিনি আশা করছিলেন। সেই সাথে তার এই বিশ্বাসও রয়েছে যে তার চাকুরীটি যে কোনো মুহুর্তে নাকচ হয়ে যেতে পারে। যদি এই মুহুর্তে রহিম সাহেব তাকে আসতে নিষেধ করে দেন তবু তিনি অবাক হবেন না। কিন্তু রহিম সাহেব তা করলেন না। হাজার হলেও তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি শহিদের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে আছেন।

পরীক্ষায় ফেল করার পরে সব ছাত্ররাই নব উদ্যমে পড়াশুনা শুরু করে। সেই সূত্র ধরেই বোধ হয় কদম স্যার হাজির হওয়ার সাথে সাথেই শহিদ বই-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে পড়তে চলে আসে। তাকে আসতে দেখে রহিম সাহেব ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে রুম থেকে বের হয়ে যান।

- কি হে! আবার নাকি ফেল মেরেছো? তো আমার চাকুরীটা কি খাবে নাকি?

বলতে বলতে সাথে নিয়ে আসা বইটি টেবিলের উপর রাখেন কদম মাস্টার। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বইটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শহিদ। তারপর হঠাৎ বেজার কণ্ঠে বলে ওঠে,

- আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে এসব রূপকথার কাহিনী পড়েন?

কদম মাস্টার বেশ জোরে জোরে মাথা নাড়েন যেনো শহিদের কথায় বড় রকমের কোনো ভুল আছে।

- না, না। রূপকথার কাহিনী নয় এটা হলো বিজ্ঞান কল্পকাহিনী, যাকে বলে সায়েন্স ফিকশন।

স্যারের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে শহিদ। হাসি না থামিয়েই বলে,

- বুদ্ধিমান গাধা আর কি!

- মানে? অনেকটা অপ্রস্তুতের মতো বলে ওঠে কদম আলী।

- মানে সহজ। গাধা যেমন বুদ্ধিমান হতে পারে না, কল্পকাহিনীও বিজ্ঞান হতে পারে না। অযৌক্তিক কল্পণা হলো কুসংস্কার, আর বিজ্ঞান সব সময় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

- বিজ্ঞান কল্প কাহিনী কি অযৌক্তিক কল্পণা?

- নয় তো কী? এই আপনার এই বইটির কথাই ধরুন, "গ্রহান্তরে যুদ্ধ"। বহু দূরে কোনো এক গ্রহে বাস করে শক্তিশালী প্রজাতির একটি প্রাণী। অত্যাধুনিক কোনো অস্ত্র-সস্ত্র তাদের হাতে নেই কিন্তু আছে প্রকৃতি প্রদত্ত বিশাল শরীর আর শক্তি। তাদের চোখগুলো কাজ করে টেলিস্কোপের মতো, হাতগুলো হাতুরীর মতো, বোমা মেরেও তাদের ঘায়েল করা যায় না ইত্যাদি। এসব কাহিনী আমাদের দেশের কানা দৈত্যের কাহিনীর চেয়ে কম আজগুবী নয়! কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের নামে বাজারে ছাড়ার কারণে এর মধ্যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান একটা গন্ধ আছে। এই গন্ধ শুকেই বোকা লোকেরা এসব কাহিনীকে বিজ্ঞান বলে মনে করে।

শহিদের কথা শুনে কদম আলী বইটির দিকে দৃষ্টি ফেলেন। বইয়ের প্রচ্ছদে একটি বিশালদেহী দৈত্যের ছবি আঁকা রয়েছে। ভুতের গল্পে যে ধরণের ছবি আঁকা থাকে অনেকটা সেরকম। শহিদের বর্ণনার সাথে বইটির কাহিনীর হুবহু মিল রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে সেও বইটি পড়েছে। তার মন্তব্যটিও যথার্থ। এসব গল্পকে বিজ্ঞান বলা মোটেও সঠিক নয়। বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন তিনি। কিন্তু এখনই তর্কে হার মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা ঘেটে-ঘুটে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার মতো একটা বক্রতা খুঁজে পেলেন তিনি।

- এসব কাহিনীকে তো কেউ বিজ্ঞান বলে না। বলে, বিজ্ঞান কল্প কাহিনী।

শহিদ আবারও হেসে ওঠে।

- এসব অবৈজ্ঞানিক গল্প-কাহিনীর আগে বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করাটাই কি অযৌক্তিক নয়? তাছাড়া একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক এসব অবৈজ্ঞানিক বই-পত্র কীভাবে পাঠ করেন সেটাই প্রশ্ন।

বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে অবৈজ্ঞানিক গল্প-কাহিনী পাঠ করার অভিযোগটি কদম মাস্টারের মনে একটা আঁচড় কাঁটে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন,

- অবৈজ্ঞানিক কিছু করা কি একেবারেই নিষেধ?

তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেখে শহিদ কিছুটা মজা পায়। গম্ভীর হয়ে বলে,

- গত কয়েক মাস ধরে আপনি তো আমাকে তাই শেখানোর চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, অবৈজ্ঞানিক যে কোনো কিছু থেকে দূরে থাকতে হবে, এগুলো কুসংস্কার। এমনকি আপনি আমাকে তাবীজ ঝুলাতে নিষেধ করেছেন।

কদম মাস্টারের এবার অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। তিনি ছোট থেকেই বিজ্ঞান ভালবাসেন। স্কুল-কলেজে সায়েন্স বিভাগে পড়াশুনা করেছেন। নিজের জীবনটাকেও বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুনে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। তাবিজ-তুমার দোয়া-দরুদ ইত্যাদিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। অন্য কথায় বলতে গেলে তিনি ধর্ম মানেন না। অন্য কেউ মেনে না নিলেও তিনি নিজেকে বিজ্ঞানী বলে মনে করেন এবং বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করেন। একারণে তিনি “বিজ্ঞান মেলা” নামে একটি মাসিক পত্রিকা নেন। আর বিখ্যাত লেখকদের লেখা বিজ্ঞান কল্প কাহিনী পাঠ করেন। কিন্তু আজ তাকে এই কল্প কাহিনী পাঠ করার কারণে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তবে বিতর্কে আজ তাকে বিজয়ী হতেই হবে। নিজেকে কিছুটা শান্ত করে তিনি বলেন,

- দেখো, বিজ্ঞান কল্পকাহীনি বিজ্ঞানের সহায়ক প্রতিবন্ধক নয়। এর সাথে এসব তাবিজ-তুমারের মতো ধর্মীয় বিষয়কে মিলিয়ে ফেললে হবে না।

কথাটি বলে, কদম মাস্টার শহিদের ডান হাতে ঝুলানো তাবীজটির দিকে হাত দিয়ে ইশারা করেন। বহুবার তিনি শহিদকে তাবিজটি খুলে ফেলতে বলেছেন কিন্তু প্রতিবারই এমন এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যাতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। শহিদ নিজেও একবার তাবিজটির দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে,

- তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন ধর্ম বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক?

- হ্যাঁ। ঠিক তাই। দেখো খৃষ্টানরা কি বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে ফাসিতে ঝুলায় নি?

কথাটি বলে কদম মাস্টার এমন ভাব করেন যেনো মাথা কিনে ফেলেছেন। কিন্তু তখনই শহিদের নির্মম উত্তরটি তার কানে আসে।

- খৃষ্টান ধর্মের কথা কে বলছে? ধর্ম বলতে আমরা বুঝি ইসলাম ধর্ম। আর সবই অধর্ম। মুসলমানরাও তো বহু বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছে তারা কোন বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে বলেন তো?

এধরণের কোনো কাহিনী কদম মাস্টারের জানা নেই। তিনি কেবল আমতা আমতা করে বলেন,

- হত্যা বোধ হয় করে নি কাউকে তবে বিজ্ঞানীদের চাঁদে যাওয়ার কথা শুনে কয়েকজন মোল্লা-মোলোবী নাখোশ হয়েছিল বলে শোনা যায়।

কথাটি বলে শহিদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকেন কদম আলী। শহিদ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে,

- নাখোশ হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। শত-সহস্র গরীব মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণ করলে তাতে অনেকেই নাখোশ হবে। কিন্তু যারা চাঁদে গিয়েছিল তাদের টেনে হেঁচড়ে ফাসির কাষ্ঠে তো আর ঝুলায় নি।

কদম মাস্টার উপর থেকে নিচে কয়েক বার মাথা নাড়েন। তার ভাব দেখে মনে হয় কথাটা অনুধান করার জন্য কিছুটা সময় নিচ্ছেন। তাকে নতুন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শহিদ বলে,

- আপনি বললেন, বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বিজ্ঞানের সহায়ক। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলেন তো।

কদম মাষ্টার বুঝে ফেলন তাকে দুই দিক থেকে নাস্তানাবুদ করার অপপ্রয়াস চলছে। এই মুহুর্তে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার ইচ্ছা তার নেই। তাছাড়া এই মুহুর্তে তার চাকুরীটিও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থায় পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্প-গুজব করা শোভনীয় নয়। তিনি শহিদের কাথা অগ্রাহ্য করে বলেন,

- ওসব থাক এবার এসো ক্লাসের বই পড়া যাক।

- কোন ক্লাসের বই স্যার?

- কেনো? তোমার ক্লাসের বই।

স্যারের কথা শুনে শহিদ মুচকি হেসে বলে,

- আমার ক্লাস কোনটি তাই তো বুঝতে পারছি না।

তার কথা শুনে কদম মাস্টার যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। একজন ছাত্র কোন ক্লাসে পড়ে যদি সেটিই না জানে তবে বিষয়টি কতখানি ভয়ংকর তা তিনি অনুধাবনের চেষ্টা করেন। শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব হচ্ছে এই মুহুর্তে তার কান ধরে ক্লাসের নামটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া কিন্তু সমস্যা হলো তিনি নিজেও বিষয়টি মনে করতে পারছেন না। প্রতিদিন শহিদ যে বই সাথে নিয়ে আসে তিনি তাকে তাই পড়িয়ে দেন। বইগুলো কোন ক্লাসের তা হয়তো তিনি কখনও লক্ষ্য করেন নি বা লক্ষ্য করলেও এখন স্মরণ নেই। তার স্মরণ শক্তির ব্যাপারে পরিচিত মহলে কিছু গল্প-গুজব প্রচলিত আছে।

তিনি নাকি একবার নিজের চশমাটি হারিয়ে ফেলেন। চশমা ছাড়া তিনি আবার চোখে ভাল দেখেন না। চিৎকার করে হাকডাক দিয়ে তিনি পরিবারের সবাইকে চশমা খুঁজতে আদেশ করেন। এদিক-ওদিক খুঁজে যখন চশমাটি পাওয়া গেল না তখন তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন,

- তোমার চশমা তুমিই খুঁজে বের করো, আমরা পারবো না।

কথাটি শুনে তিনি আবার চিৎকার করে বলেন,

- আমি এখন বারান্দায় বসে পেপার পড়ছি। আমার সময় নেই। তুমি আরেক বার খুঁজে দেখো।

পেপার পড়ার কথা শুনে তার মিসেসের মনে একটা খটকা লাগে। বারান্দায় গিয়ে দেখেন যা ভেবেছেন তাই। কদম আলী নিজের চশমাটা চোখে দিয়ে দিব্যি পেপার পড়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীকে দেখে পেপার থেকে মুখ তুলে বললেন,

- আমার চশমাটা পেয়েছো?

এরকম আরও কিছু কাহিনী আছে যার সবগুলো সত্যি না হলেও পুরোটা যে মিথ্যা নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। সুতরাং নিজের স্মরণ শক্তির উপর ভরসা করতে পারলেন না কদম মাস্টার। তিনি রাগত স্বরে বললেন,

- নিজের ক্লাস কি তা মনে করতে পারছো না। এটা আবার কেমন কথা?

শহিদ উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

- মনে করতে পারছি না তা তো বলিনি। আমি বলেছি বুঝতে পারছি না।

- কেনো, বুঝতে পারছো না কেনো?

- কারণ সহজ। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করেছি। বাবা যদি সুপারিশ করে তাহরে হেড মাস্টার ক্লাস এইটে দয়া করে প্রমশন দিতেও পারেন আর যদি তা না করে তবে ক্লাস সেভেনেই থেকে যেতে হবে। এখন সেভেনের বই পড়বো না কি এইটের বই পড়বো?

কদম সাহেব নিজেও প্রশ্নটির কোনো সদুত্তর খুঁজে পেলেন না। তবে তিনি পুরোনো বিতর্কে ফিরে যেতেও চাচ্ছেন না। তিনি আলোচনাকে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করার জন্য বলেন,

- এতো পন্ডিত তো বিজ্ঞানে ফেল করেছো কেনো!

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে শহিদ উত্তর দেয়,

- যারা পরীক্ষার প্রশ্ন করে আর খাতা দেখে তারা সবাই বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ তাই প্রশ্ন পড়েও মজা হয় না উত্তর লিখেও নাম্বার পাওয়া যায় না।

কথাটি শুনে কদম আলী অপমান বোধ করেন। তিনি নিজেও পরীক্ষার খাতা দেখেন। অর্থাৎ শহিদের কথা অনুযায়ী তিনিও বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। এই কথাটি মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকটা চ্যালেঞ্জের সূরে তিনি বলেন,

- এই দেখো, আমি একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক। ত্রিশ বছর ধরে আমি বিজ্ঞান পড়াই, পরীক্ষা নিই, খাতাও দেখি। আমাকে দেখে কি অজ্ঞ মনে হয়?

কথাটি শুনে শহিদের মনে কিছুটা মমতার সৃষ্টি হয়। নিজের কথাটি সংশোধন করে নিয়ে বলে,

- না, অজ্ঞ হয়তো নন কিন্তু খুব যে বিজ্ঞ তাও কিন্তু নয়। একটা প্রশ্ন করলেই বিষয়টি জানা যাবে।

শহিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন কদম মাস্টার। গম্ভীর মুখে বলেন,

- দেখি কি প্রশ্ন করো তুমি।

অনুমতি পেয়ে শহিদ শুরু করে,

- আইনস্ট্যাইনের একটা সূত্র আছে $E=mc^2$ এটা কি জানেন?

কদম মাস্টার মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। ত্রিশ বছরে বোধ হয় ত্রিশ হাজার বার সূত্রটি ব্লাক বোর্ডে লিখেছেন তিনি। ছাত্রদের এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আজ এই সূত্রটি সম্পর্কে এমন কি প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন তা বুঝতে পারছেন না। তাকে বেশিক্ষণ চিন্তা করার সুযোগ না দিয়ে শহিদ বলে,

- এই সূত্রটি একটু ব্যাখ্যা করেন তো।

প্রশ্নটি কদম মাস্টারের নিকট ভীষণ সহজ মনে হয়। তিনি গড়গড় করে বলতে শুরু করেন,

- E হচ্ছে শক্তির প্রতীক, m হচ্ছে ভর আর c হচ্ছে গতিবেগ। এই সূত্রটির অর্থ হলো ভরের সাথে গতিবেগের বর্গকে গুণ করলে শক্তির পরিমাণটি জানা যাবে।

অনেকটা তাচ্ছিল্যের সাথে শহিদ বলে, এটা তো গতানুগতিক একটা ব্যাখ্যা। সবাই এটা জানে। যদি আরেকটা প্রশ্ন করে আপনার মাথাটা আওলিয়ে দিই তাহলে কি সঠিক উত্তর বলতে পারবেন?

- হ্যাঁ নিশ্চয় পারবো, বলো তো দেখি তোমার কি প্রশ্ন।

- ধরুন একটা মোটা-সোটা লোক ভীষন বেগে দৌড়ে যাচ্ছে। এতে করে লোকটির এনার্জি তথা শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমে যাচ্ছে?

কদম মাস্টার নিরব থাকেন তিনি এখনও বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছেন না। তাকে নিরব দেখে শহিদ বলে,

- কমে যাচ্ছে তাই নয় কি? একটু পরই তার সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং এক সময় বেচারা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে। এক্ষেত্রে লোকটি যত মোটা হবে এবং যত দ্রুত দৌড়াবে ততই দ্রুত তার শক্তি কমে আসবে। ঠিক?

কদম মাস্টার মাথা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়েন। তিনি এখনও প্রকৃত সমস্যাটি ধরতে পারেন নি। তাকে বিব্রত হতে দেখে শহিদের একটু মজাই লাগে। সে এবার মুল প্রশ্নটি ছুড়ে দেয়,

- আইনস্টাইনের সূত্র বলছে ভর এবং গতিবেগ যত বেশি হবে ততই শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে কিন্তু আমরা দেখছি কমে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কি?

কদম মাস্টার হতভম্ব হয়ে গেলেন। এমন প্রশ্ন তিনি জীবনে শোনেন নি। এর উত্তরও তার জানা নেই। তিনি কেবল মিন মিন করে বলেন,

- তুমি কি বলতে চাচ্ছো আইনস্টাইনের সূত্রে ভুল আছে?

- না আমি তা বলতে চাচ্ছি না। সূত্র ঠিকই আছে। কিন্তু আমি দেখতে চাচ্ছি এখন যারা নিজেদের বিজ্ঞানমনা বলে দাবী করে তাদের মাথায় ঘিলু আছে কিনা।

কদম মাস্টারকে বেশ চিন্তিত মনে হলো। তার মাথায় ঘিলু আছে কিনা সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ করলে চিন্তিত হওয়ারই কথা। এই মুহুর্তে প্রশ্নটির যথাযোগ্য উত্তর বের

করে তা শহিদকে শুনিয়ে দিয়ে মাথা বাঁচানো দরকার। তিনি প্রাণ-পনে সে চেষ্টাই করলেন কিন্তু। প্রশ্নটির ভুল বা সঠিক কোনো উত্তরই জোগাড় করতে না পেড়ে শেষে আত্মসমর্পণ করে বললেন,

- নাহ্। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে বলে তো মনে হয় না।

কদম মাস্টারকে আরেকটু নাজেহাল করার লোভ শামলাতে পারে না শহিদ। দুঃচিন্তার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলে,

- তবে কি আইনস্টাইন সত্যি সত্যিই ভুল করেছেন?

এই প্রশ্নটি মাস্টার সাহেব কে দোটানার মধ্যে ফেলে দেয়। শেষে রেগেমেগে বলেন,

- আইনস্টাইন একজন মানুষ ছিলেন তিনিও তো ভুল করতে পারেন তাই না?

শহিদ একটি খুশি হয়ে বলে,

- হ্যাঁ হ্যা ভুল তো তিনি অবশ্যই করেছেন। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হলো তিনি মুসলিম হয়ে মরতে পারেন নি, বেধর্মী হয়ে মারা গেছেন। এতে তার দুনিয়া-আখিরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই সূত্রটি কিন্তু ঠিকই আছে।

কদম মাষ্টার এবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। অনুরোধের স্বরে বলেন,

- তা হলে বিষয়টির ব্যাখ্যা কি বলো দেখি।

- ব্যাখ্যা তো সহজ। দেখুন আইনস্টাইন তার সূত্রে শক্তি বলতে কোনো প্রাণীর জৈবিক শক্তিকে বোঝান নি তিনি বলেছেন বস্তুগত শক্তির কথা। একটি বস্তুর ভর যতটা বেশি তাকে গতিশীল রাখতে তত বেশি শক্তির প্রয়োজন এবং বস্তুটিকে আরও বেশি গতিশীল করতে হলে শক্তির প্রয়োজন হবে আরও বেশি। যে ব্যক্তি দৌড়িয়ে যায় নিজের শরীরকে গতিশীল রাখার জন্য তাকে প্রচুর পরিমান শক্তি ব্যায় করতে হয়। তাই তো সে দূর্বল হয়ে পড়ে। তার ভর যত বেশি হবে এবং তার গতি যত বেশি হবে শক্তি ব্যায়ও হবে তত বেশি একারণে সে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাবে। একইভাবে গতিশীল কোনো বস্তু যখন কোথাও আঘাত হানে তখন তার ভর ও গতিবেগের উপর নির্ভর করে আঘাতটা কতটা শক্তিশালী হবে। বুঝেছেন?

কদম মাস্টার মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। ছোট্ট একটা জটিলতার কারণে এতক্ষণ তিনি এটা অনুধাবন করতে পারেন নি। নিজের অজান্তেই তিনি বলে ওঠেন।

- খুবই চমৎকার ব্যাখ্যা।

কথাটি শুনে শহিদ একগাল হেসে ওঠে। তাকে হাসতে দেখে কদম আলী মাস্টার একটু নড়ে চড়ে বসেন। প্রতিপক্ষকে এধরণের ভূয়সী প্রশংসা করা অনুচিৎ হবে ভেবে নিরব হয়ে যান তিনি। সেই সুযোগে শহিদ পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে আসার চেষ্টা করে।

- কল্প কাহিনী কিভাবে বিজ্ঞানের সহায়ক হতে পারে সেটা কিন্তু বলেন নি।

কদম মাস্টার আবার বিব্রত বোধ করেন। ঘড়ির দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেন। এতক্ষণে সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময় যেনো আজ আটকে গেছে। সময় আটকে যাওয়ার কথা মনে হতেই তার মনে পড়ে অনেক আগে পড়া একটি উপন্যাসের কথা। সেটাও একটি বিজ্ঞান কল্প কাহিনী। কাহিনীটির নাম ‘‘একটি অনন্ত বিকাল’’। কিছু বিজ্ঞানী সময় নিয়ে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কীভাবে অতীতে বা ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা যায় এই প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ। তাদের পর্যবেক্ষণ সফল হলো কিন্তু সামান্য একটা ভুল হওয়ার কারণে সময় স্থির হয়ে গেলো। বিকাল বেলা পর্যবেক্ষণটি করা হয়েছিল। সময় সেই বিকালেই আটকে গেলো। এই বিকালের পর আর কখনও সন্ধ্যা নামবে না। একটি অনন্ত বিকাল। কদম আলীর মনে হলো আজও হয়তো সময় আটকে গেছে। এই রাত কখনও ফুরাবে না। সারা জীবন ধরে তাকে এই বকাটে ছেলেটির সাথে বিতর্ক করে যেতে হবে। বিষয়টি কল্পণা করতেই তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বলে ওঠেন,

- অসম্ভব, অযৌক্তিক!

স্যারের উদ্ভট মন্তব্যে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে যায় শহিদ।

- কি আজে-বাজে বকছেন, স্যার?

শহিদের কথা শুনে সম্ভিত ফিরে পেলেন কদম মাস্টার। লম্বা-চওড়া একটা মুচকি হেসে বললেন,

- দেখো, কল্প কাহিনীগুলো অনুমান করে লেখা হয়। সাধরনত যেসব বিষয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি সেগুলো নিয়ে কল্প কাহিনী রচনা করা হয়। পরবর্তীরা বিজ্ঞানীরা সেগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। আসলে বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই শুরু হয় অনুমান দিয়ে। আগে অনুমান তার পর পর্বেক্ষণ করে প্রমাণ করতে পারলেই হয়ে গেলো বিজ্ঞান। অন্য কথায় বলতে পারো অনুমান হলো বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ।

কদম স্যার কি বলবেন শহিদ আগে থেকেই জানতো। কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বলল,

- বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই অনুমানের মাধ্যমে শুরু হয় কথাটি হয়তো সত্যি কিন্তু কল্প কাহিনীর সাথে তার পার্থক্য হলো ঐ অনুমানগুলো করেন বিজ্ঞানীরা ফলে নির্দিষ্ট একটা সীমা-রেখার মধ্যে অনুমান করেন তাই সেটা বাস্তাবায়িত করা সম্ভব হয়। কিন্তু কল্প কাহিনী লেখে সাহিত্যিকরা তারা লাগাম ছাড়া অনুমান করে। সেসব অনুমানের বেশিরভাগই বাস্তাবায়িত করা সম্ভব নয়। বরং তার পিছে সময় নষ্ট করলে বিজ্ঞান অনেক দূর পিছিয়ে যাবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে।

কদম মাস্টার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে শহিদ বলে,

- এই যেমন ধরুন সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করার বিষয়ে বহু সংখ্যক কল্প কাহিনী লেখা হয়েছে। একজন ব্যক্তি একটা সময় যন্ত্র আবিষ্কার করলো তার পর সেটা কাজে লাগিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর অতীতে ফিরে গেলো, সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে আবার ফিরে আসলো। যদি এই সব কাহিনীতে বিভ্রান্ত হয়ে বিজ্ঞানীরা সময় যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন তবে সেটা কি কল্যাণকর হবে? এতটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, কল্প কাহিনীগুলো বাস্তবায়িত করার মতো নয়, সেগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য লেখাও হয় না। বিজ্ঞানীরা সেগুলো লেখে না, সাধারনত কোনো বিজ্ঞানী এসব পড়েও না।

কদম মাস্টার একটু অনুযোগের স্বরে বলেন,

- বিজ্ঞানীরা যদি এসব নাই পড়বেন তাহলে নতুন নতুন আবিষ্কারের চিন্তা তাদের মাথায় কিভাবে আসে?

- কীভাবে আবার! প্রকৃতিকভাবে। এই যেমন ধরুন, জোনাকী পোকার পিছনে আলো জ্বলতে দেখে এবং আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে বৈদ্যুতিক বাল্বের চিন্তা বিজ্ঞানীদের মাথায় আসে। পাখিদের আকাশে ওড়া দেখে উড়ো জাহাজ তৈরীর পরিকল্পণা শুরু হয় ইত্যাদি। মোট কথা প্রকৃতিতে ঘটমান বাস্তব ঘটনাগুলোর উপর গবেষণা করেই নতুন নতুন আবিষ্কার বাস্তবয়ন করা সম্ভব, অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে নয়। নিউটনের আপেল পড়ার ঘটনাটির কথায় ধরুন না .....

এতদূর বলতেই কদম মাস্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন,

- তুমি বলতে চাচ্ছো বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখেনি?

- এগিয়ে নেওয়া তো দূরে থাক বরং পিছিয়ে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের সাথে কল্পনাকে মিশ্রিত করে যেটা তৈরী হয়েছে সেটার নাম দেওয়া যায় কল্পিত বিজ্ঞান। এই কল্পিত বিজ্ঞানের কারণে প্রকৃত জ্ঞান আড়াল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উদ্ভট কল্পনাও

এখন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানে পরিনত হয়েছে।

উদ্ভট কল্পণা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানে পরিনত হয়েছে এই কথাটি কদম আলীর নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। তিনি বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

- উদ্ভট কল্পণা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানে পরিনত হয়েছে এর একটা উদহরণ দাও তো দেখি।

অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শহিদ বলে উঠলো,

- কেনো? বিবর্তনবাদ।

- তুমি ডারউইনের বিবর্তনাবাদের কথা বলছো?

শহিদ মৃদ তালে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে,

- আবার কার? ঐ বানর থেকে মানুষ হওয়ার কল্পকাহিনীটির কথাই বলছি।

বিস্ময়ে কদম আলী মাস্টারের দম বন্ধ হয়ে আসে।

- তুমি এটাকে কল্প কাহিণী বলছো! সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তো এটাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

শহিদ ডান থেকে বায়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে,

- স্বীকার করে নিয়েছে কথাটি হয়তো সঠিক নয় আসলে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এর শিকারে পরিণত হয়েছে।

- মানে?

- মানে খুবই স্পষ্ট। ধর্মদ্রোহী নাস্তিকরাই এখন বিশ্বের মোড়ল-মাতব্বর। তাদের সন্তুষ্ট করে সহজে সুনাম কুড়াবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো নাস্তিকতাকে উসকে দেয় এমন ভ্রান্ত মতামতের পক্ষে ছাপাই গাওয়া। বিখ্যাত হতে হলে এই কল্পকাহিনীটি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

নিজের হাতের উপরেই প্রকাণ্ড একটা ঘুষি মেরে কদম আলী বলেন,

- বিতর্তনবাদ একটা কল্প কাহিনী! ডারউইনের অরিজিন অব স্পিসেস একটা কল্প কাহিণীর বই!

স্যারের এ ধরণের প্রতিক্রিয়া বেশ আনন্দের সাথে উপভোগ করে শহিদ। টেবিলে রাখা বইটির দিকে ইশারা করে বলে,

- ঐটা আর এইটা একই জিনিস।

কদম আলী মাস্টার "গ্রহান্তরে যুদ্ধ" নামক বইটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বইয়ের প্রচ্ছদে আঁকা দৈত্যটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করেন। তার নিজের মুখেই একটা বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠে। নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন,

- এটা নিঃসন্দেহ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। কিন্তু এর সাথে তুমি বিবর্তনবাদকে এক করছো কেনো?

- কারণ, এই কাহিনীটির মতোই বিবর্তনবাদও একটা কল্পণা মাত্র। এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, পর্যবেক্ষণ করেও এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত ডারউইনের ইচ্ছা ছিল বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত লেখাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী সায়েন্স ফিকশন হিসেবে বাজারে ছাড়া কিন্তু নাস্তিকরা নিজেদের স্বার্থেই বিষয়টিকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রচার করেছে।

কদম আলী মাস্টার বলেন,

- প্রমাণ নেই কেনো বলছো? আমার জানা মতে বিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে বহু সংখ্যক প্রমাণ হাজির করেছেন।

শহিদ চ্যালেঞ্জের স্বরে বলে,

- কেমন প্রমাণ, দু'একটা বলেন তো দেখি!

শহিদের চ্যাল্যেঞ্জের মুখে কদম আলী মাস্টারের চোখের সামনে সব কিছু ধোয়াসা মনে হয়। এ বিষয়ে তেমন কিছু তার পড়া নেই। যতটুকু পড়েছেন তাও মনে করতে পারছেন না। আমতা আমতা করে বলেন,

- আমি বিস্তারিত কিছু বলতে পারবো না। আমার এক বন্ধু আছে প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক। সে আবার এসব ব্যাপারে পাঁকাপোক্ত পন্ডিত। তুমি যদি চাও তবে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি তার কাছে। তুমি কি যাবে?

শহিদ মাথা নাড়ে। যে যাবে। নতুন একজন পন্ডিতকে নাজেহাল করার তৃপ্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সে ভীষন উৎসাহ নিয়ে বলে,

- তবে কালই যাওয়া যাক।

টেবিলে রাখা বইটি হাতে নিয়ে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে কদম আলী মাস্টার বলেন,

- তবে সকালেই আমার বাড়ি চলে আসবে আমি তোমার জন্য তৈরী হয়ে থাকবো।

কথাটি বলে, তিনি দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যান।

দুই.

কদম আলীর বন্ধুর নাম হাসমত। ছোট বেলায় তারা তাকে হাসু বলে ডাকতেন। কেউ কেউ আবার দুষ্টমী করে বলতো হাস। দুষ্টু ছেলেরা তাকে রাগানোর জন্য ছড়া কেটে বলতো,

হাসু, হাসু - হাস

রাজা হাস না পাতি হাস?

একটি বেসরকারী কলেজে প্রাণিবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি। এর বাইরে আরও একটি পরিচয় আছে তার। মাঝে মধ্যে সময় সুযোগ পেলে কাব্যচর্চার অভ্যাস থাকায় বন্ধু মহলে তিনি কবি হিসেবেও পরিচিত। কোনো কোনো পত্রিকায় 'কানাই দাস' ছদ্মনামে তার কিছু কবিতাও ছাপা হয়েছে। একারণে অনেকেই তাকে কানাই দাস নামে ডাকে। কেউ আবার বলে পাগলা কানাই। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, পরিচিত মহলে ছদ্মনামের চাপে বেচারার আসল নাম ঢাকা পড়ে গেছে। এ নিয়ে অবশ্য হাসমত সাহেব বেশ একটা চিন্তিত নন। ব্যক্তি যখন তিনি নিজেই তখন আসল আর নকল নামে তার কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

পরের দিন কমদ আলী মাষ্টার শহিদকে সাথে নিয়ে একটি রিকশায় উঠে বসলেন। রিকশাটি সর্পিলাকারে এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করে একটি বহুতল ভবনের সামনে এসে দাড়ালো আর প্রাই সাথে সাথেই মাষ্টার সাহেব রিকশা থেকে নেমে বাড়ির দরজায় নক করতে শুরু করলেন। শহিদ বুঝতে পারল তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছে তবে রিকশা থেকে নামার পূর্বে বহুতল ভবনটির দিকে একটা দীর্ঘ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। এরই মধ্যে দরজাটি খুলে গেলো। সাথে সাথেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো নিম্ন মানের পোশাক পরিহিত মাঝ বয়সী একজন ব্যক্তির বিরক্ত চেহারা। এই ব্যক্তি যে, কদম আলীর বন্ধু নয় এবং তারা যে একে অপরের পরিচিত নয় এটা বুঝতে শহিদের কষ্ট হলো না তবে সে লক্ষ্য করলো মাষ্টার সাহেব এই অপরিচিত ব্যক্তিকে কিছু একটা প্রশ্ন করলে তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন এবং হাতের তিনটি আঙ্গুল উঁচিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন। তখনই কদম আলী চিৎকার করে উঠলেন,

- এখনও বসে আছো যে? চলো, তিন তলায় উঠতে হবে।

কথাটি শুনেই শহিদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়লো। রিকশাওয়ালা বেচারা তখনও আধাবয়সী লোকটির দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার পাওনা

মিটিয়ে না দিয়েই লোকটি ভেগে যাওয়ার মতলব আঁটছে কিনা তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সে মুখ খোলার আগেই কদম আলী পকেট থেকে কটা টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

- দু’ টাকা কম দিয়েছি।

কথাটি শেষ হতেই শহিদকে সাথে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন কদম আলী।

রিকশাওয়ালা পরম যত্নে টাকাগুলো গুনে দেখলো। দু’টাকা কম হয়েছে দেখেও সে হৈ চৈ করলো না। কদম আলীর উপর তার খুব বেশি রাগও হলো না। লোকটা কৃপণ হতে পারে কিন্তু ঠগ-বাটপার তো নয়!

তিন তলায় উঠে দেখা গেলো সারি সরি বদ্ধ দরজা। প্রথমেই যে দরজাটি চোখে পড়ল তার উপরে লেখা- “ডাঃ মোজাফফর হোসেন”। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখা গেলো একটি দরজার উপরে লেখা আছে- জনাব হাসমত, কবি ও বিজ্ঞানী। লেখাটি পড়ে কদম আলীর চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে গেল। ডান হাতের চারটি আঙ্গুল দিয়ে দু’চার বার দরজাতে নক করতেই দরজাটি খুলে গেলো। ভিতর থেকে যিনি বের হয়ে আসলেন তাকে দেখে শহিদের চোখ চড়ক গাছে উঠে গেলো। মাস্টার সাহেবের সমবয়সী একজন আধাবৃদ্ধ। মাথার চুল উসকো-খুসকো। সম্পূর্ণ চেহারা গোফ-দাড়িতে এমনভাবে আবৃত যে, কোনটি চোখ আর কোনটি নাক তা বুঝে নেওয়াই কষ্ট। মুখের তো কোনো খবরই নেই। পুরো দুই ইঞ্চি পুরু গোফের নিচে ঠোট দুটো আটকা পড়ে আছে। অবয়বের দিক থেকে লোকটি সম্ভবত রবিন্দ্রনাথের অনুকরণের চেষ্টা করেছে। লোকটির গোফের দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে শহিদ। তার মুখের ওপরে অবস্থিত এই পুরু পর্দা ভেদ করে লোকটি পানাহার কিভাবে করে সেটিই তার ভাবনার বিষয়। হঠাৎ দেখা যায় গোফগুলো নড়েচড়ে উঠলো আর সাথে সাথেই লোকটির কণ্ঠ শোনা গেলো।

- আরে কদু যে, কেমন আছিস?

নিজের ছাত্রের সামনে তাকে কদু নামে ডাকতে শুনে কদম আলী বন্ধুর উপর বেশ চটে গেলেন। তার ইচ্ছা হলো, এখনই রাজাহাস বা পাতিহাস একটা কিছু বলে শোধ করে নেন। কিন্তু নতুন মেহমান সাথে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে আগমণ করেছেন, বোকামী করলে অপমান হতে হয় কিনা সে ভয়ে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। খুশি হওয়ার ভান করে বলেন,

- হ্যাঁ বেশ ভালই আছি। তুই কেমন আছিস বল।

প্রশ্নটির উত্তর না দিয়েই হাতের ইশারায় কদম আলীকে ভিতরে প্রবেশ করতে

অনুরোধ করে নিজে পথ দেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে লোকটি। বাকী দুজন তার পিছু লাইন দিয়ে চলতে শুরু করে। কিম্ভুতকিমার লোকটি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো তার উপরে লেখা ছিল, ল্যাবরেটরী/লাইব্রেরী। একটি মাত্র ঘর কীভাবে একইসাথে ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরীর দায়িত্ব পালন করতে পারে তা ভেবে শহিদ অবাক না হয়ে পারে না। সে ভাবে এই ঘরের মধ্যে কত বই আর যন্ত্রপাতিই না ঠাসা-ঠাসি করে ভর্তি করা আছে। ভিতরে ঢুকে অবশ্য খুব বেশি অবাক হতে হলো না। দু'চারটি যন্ত্রপাতি আর ডজনখানেক বই-পুস্তক এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। বড় একটা বইয়ের তাক অবশ্য ছিল যার সিংহভাগই খালি পড়ে রয়েছে। এছাড়া ঘরটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঘরের মালিকের মতোই ঘরটিও সমানভাবে অগোছালো। একটি টেবিলের ওপাশে রাখা গদি চেয়ারটিতে বসতে বসতে লোকটি মেহমানদের উদ্দেশ্যে বলে,

- এখানে বসো।

শহিদ নিজের সামনে থাকা একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। কদম আলীর সামনেও একটি চেয়ার রয়েছে কিন্তু তিনি এখনও বসেন নি। শহিদ লক্ষ্য করে মাস্টার সাহেব করুন দৃষ্টিতে চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে আছেন। এতক্ষণে ঘটনা অনুমান করতে পারে সে। মাস্টার সাহেব আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। তিনি নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খুব বেশি ধার ধারেন তা নয় তবে তার স্ত্রী এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী। এখানে সেখানে যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে কাপড় কেচে তুলে রাখেন তিনি। মাস্টার সাহেব আজ সেই কাপড়ই পরে এসেছেন। এই লাইব্রেরী ওরফে ল্যাবরেটরীর চেয়ারগুলো বেজায় নোংরা। এর উপর বসে নিজের কাপড়গুলো নষ্ট করে ফেললে বাড়ি যেয়ে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীণ হতে হবে ভেবে আসন গ্রহণ হতে বিরত থাকেন কদম আলী। তাকে ওভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে কানাই বাবু রেগে গেলেন বলে মনে হয়। অনেকটা চেচিয়ে বললেন,

- কি রে বাদরের মতো দাড়িয়ে থাকলি কেনো?

এধরণের খোলা তিরষ্কারে বাধ্য হয়ে কদম আলী ময়লা চেয়ারটিতে বসে পড়েন। শহিদ এবার তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাসমত সাহেবের দিকে দৃষ্টি ফেলে। সেই পুরোনো চেহারা। উসকো খুসকো চুল আর দাড়ি-গোফে মিশ্রত উদ্ভট অবয়ব। শহিদের কেনো জানি মনে হয় লোকটিকে দেখতে হুবহু বানরের মতো মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে। এই বানরসদৃশ লোকটির সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা নিরাপদ কিনা সেটিই তার প্রশ্ন। যদি এই ব্যক্তি বলে তিনি নিজেই গতকাল বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছেন তবু

বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে তর্কে নিশ্চিত পরাজয় হবে শহিদের। তবে কোনো মানুষ নিজেকে বানর পরিচয় দিতে পছন্দ করবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। সেটা দেখার জন্য শহিদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সবাই কিছুক্ষণ নিরব থাকে তারপর হাসমত সাহেব কথা শুরু করেন।

- তা কি জন্য এসেছিস বল।

কদম আলী এখনও পরিপার্শ্বের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। এখনও তার মুখ থেকে বিরক্তির ছাপ দূর হয় নি। কিছুক্ষণ নিরব থেকে তিনি বলেন,

- এ হলো আমার এক ছাত্র, নাম শহিদ।

কদম আলীর হাতের ইশারা মোতাবেক শহিদের দিকে দৃষ্টি ফেলেন হাসমত সাহেব। কিছুক্ষণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে কদম আলীর দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিয়ে উপর থেকে নিচে কয়েক বার মাথা ঝাকান তিনি। অর্থাৎ কথার প্রথম অংশ অনুধাবন করেছেন এখন বাকীটা শুনতে চান। কদম আলী বলতে থাকেন।

- ছেলেটি ভীষণ মেধাবী আর ব্রিলিয়ান্ট।

নিজের মুখের সামনে অন্য কারও প্রসংশা শুনতে অভ্যস্ত নন কানাই বাবু। তিনি কদম আলীকে বাধা দিয়ে বলেন,

- মেধাবী আর ব্রিলিয়ান্ট একই কথা। অযথা প্রলম্বন না করে আসল ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করো। সময় নষ্ট করো না।

কথায় ছেদ পড়ায় কদম আলী বিরক্ত হলেন কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললেন,

- সে বিবর্তনবাদকে কল্পকাহিনী মনে করে।

হাসমত সাহেব বিবর্তনবাদকে কল্পকাহিনী মনে করার ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি যদিও কবি সাহিত্যিক মানুষ তবে কদম আলী যদি এক দেড় ঘন্টার আলোচনা এক কথায় প্রকাশ করতে চায় তবে বুঝতে তার কিছু সমস্যা হবারই কথা। তাকে বুঝতে অক্ষম দেখে কদম আলী আরেকটু খোলোসা করে বলেন,

- বিবর্তনবাদ না কি ডারউইনের অনুমান মাত্র এর স্বপক্ষে নাকি কোনো দলিল প্রমাণ নেই?

এতক্ষণে হাসমত সাহেব বুঝতে পারেন কল্পকাহিনী বলতে বোঝানো হচ্ছে দলিল বিহীন কাহিনী যা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে বলা হয়। তিনি এটাও বুঝে নিলেন যে, কদম আলীর সাথে আসা এবং তার সামনে বসা এই পুঁচকে ছেলেটি

ডারইউনের প্রস্তাবিত বিবর্তনবাদকে অনুমান নির্ভর কল্পকাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছে। একারণে তার বন্ধুবর ভীষণ রেগে ছেলেটির কান পাকড়ে তার সামনে হাজির করেছে যাতে তিনি তাকে কিছুক্ষণ বকাঝকা করেন। বন্ধুর ইচ্ছামত বকাঝকা শুরু করার পূর্বে হাসমত সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে নেন। প্রাণিবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে তিনি জানেন, ছেলেটি ঠিকই বলেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কেউ ঠিক কথা বললেই যে তাকে বকা-ঝকা করা যাবে না তা নয়। হাসমত সাহেব এখন সে কৌশলই তালাশ করছেন। মনে মনে নিজের মতামতটি ভালভাবে গুছিয়ে নিয়ে শহিদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করেন তিনি,

- দেখো বিবর্তনবাদ একটা কল্পকাহিনী এটা সঠিক কথা......... ।

তার কথা শুনে শহিদ এবং তার মাস্টার সাহেব উভয়ই ভীষণ অবাক হয়। মাস্টার সাহেব তো প্রায় চেচিয়ে ওঠেন।

- বিবর্তনবাদ একটা কল্প কাহিনী এটা সঠিক কথা! তুই কি পাগল হয়েছিস?

কথিত আছে, যে প্রকৃতই পাগল তাকে পাগল বললে রেগে যায়। সম্ভবত সেই সূত্রেই কানাইবাবু ভীষণ রেগে গেলেন। সাপের মতো ফোস ফোস করে বললেন,

- আমি পাগল হবো কেনো! পাগল তো তুই। ডারউইন নিজেই বলেছে বিবর্তনবাদ একটা অনুমান, এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, এটা তুই জানিস? আজ অবধি বিজ্ঞানীরা এই মতবাদকে নিশ্চিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেনি বরং এটা একটা মতবাদ বা প্রস্তাবনা হিসেবেই টিকে আছে সেটা কি তোর জানা আছে?

কদম মাষ্টারের এসব বিষয়ে জানা নেই। তিনি এগুলো জানতে এখানে আসেন নি। তিনি রেগে মেগে আগুন হয়ে বলেন,

- তবে কি তুই নিজেও বিবর্তনের মতবাদকে মিথ্যা মনে করিস?

কানাই বাবু ডান থেকে বায়ে মাথা ঝাকাতে থাকেন।

- আমি কি সে কথা বলেছি। আমি তো বলেছি বিজ্ঞানীরা এটা গ্রহণ করে নি। কিন্তু আমি তো আর শুধু বিজ্ঞানী নই। আমি কবি ও বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী হিসেবে কোনো অযৌক্তিক কল্পণা করা আমার পক্ষে অনুচিত কথাটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে যে কোনো বিষয়ে কল্পণা করার অধিকার আমার আছে। একারণে দেখা যায় সারা বিশ্বের বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখকরা তাদের বই-পুস্তকে বিবর্তনবাদের পক্ষে কথা বলে। আমিও তাদের সাথে একমত।

কানাই বাবুকে বিবর্তনবাদের পক্ষে অবস্থান নিতে দেখে মাস্টার সাহেব ভীষণ খুশি হোন। অনেকটা আবেগপ্রবন হয়ে বলেন,

- তাহলে এই ছেলেটার সাথে তোমার বিতর্ক করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে মানুষ বহু বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট। এখানে কোনো স্রষ্টার ভূমিকা নেই। পরাক্রমশালী কোনো স্রষ্টার আদৌ অস্তিত্ব নেই।

স্রষ্টা এবং তার অস্তিত্বের কথা শুনে কানাই বাবুর ভাবাবেগে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। ঘন দাড়ি-গোফের মধ্য দিয়েও অনুভব করা যায় তার মুখটা সংকুচিত হয়ে এসেছে। কিছুটা বিরক্তি আর কিছুটা আতংকে তার শরীর শিউরে উঠেছে। জীবনে তিনি বহু পাপ করেছেন। মোট ত্রিশ জন প্রার্থীর মধ্যে মেথা তালিকায় পনের নম্বরে থেকেও ঘুষের মাধ্যমে নিজের চাকুরীটি করায়ত্ব করেছেন। দিনের পর দিন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কাব্য চর্চা করেছেন। অশিক্ষিত ভাইদের ঠকিয়ে বাবার জমা-জমি সব নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। এখন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ হলে তো তার দফা রফা হয়ে যাবে। পাপ-পূন্যের হিসাব-নিকাশ, আখিরাতের কঠিন বিচার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতীত হওয়ার কোনো ইচ্ছা আপাতত তার নেই। নিজের ভুল স্বীকার করে সেগুলো শুধরে নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, স্রষ্টাকে অস্বীকার করা ছাড়া তার ভিন্ন কোনো উপায় নেই। একারনেই তিনি অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক জেনেও ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বিবর্তনবাদ এখানে মূল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপারটি হলো স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। বিবর্তনবাদের মধ্যে সুক্ষ্ম একটি সূত্র রয়েছে যা স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই বিষয়টি হলো প্রকৃতিক নির্বাচন। ঘটনা হলো, নাস্তিকরা যখনই বলে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই মানুষ বলে, একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ছাড়া মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হলো? মানুষের চোখ-মুখ, হাত-পা, মুখের মধ্যে দাত, মাথার উপর চুল ইত্যাদি যা কিছুর প্রয়োজন সেগুলো কি এমনি এমনি হতে পারে? স্বাভাবিকভাবে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, এটা এমনি এমনি হতে পারে না। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে যাতে প্রমাণিত হয় এগুলো এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে। এই সূত্রটির কারণেই নাস্তিক মহলে মতবাদটির এত জনপ্রিয়তা। এই চিন্তাগুলো হাসমত সাহেবের অবচেতন মনে মুহুর্তের মধ্যে ভেসে ওঠে। তার অন্তরে একটা অজানা আতংক ভর করে। এই বাচ্চা ছেলেটা কি বিবর্তনের এই সূত্রকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে! তবে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাসমত সাহেব সারা জীবন ধরে যে জাল বুনেছেন মুহর্তে তা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নাস্তিকতাকে পরিত্যাগ করে তাকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহর নিকট ধরাসায়ী হওয়ার ভয়ে সকল মানুষের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। নিজের

অজান্তেই তিনি বলে ওঠেন।

- না, না এটা সম্ভব নয়।

কদম আলী পূর্বাপেক্ষা অধিক রাগান্বীত হয়ে বলেন,

- কেনো সম্ভব নয়? এইটুকু পুঁচকে বাচ্চার সাথে বিতর্ক করতে তুমি ভয় পাচ্ছো?

এতক্ষণে হাসমত সাহেব বাস্তবে ফিরে আসেন। কদম আলীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন,

- ভয় পাচ্ছি? কে বলল, ভয় পাচ্ছি?

- তুমি নিজেই একথা বলেছো, তুমি বলেছো, এর সাথে বিতর্ক করা সম্ভব নয়।

কথাটি বলে কদম আলী শহিদের দিকে হাত তুলে ইশারা করেন। তার হাতের ইশারা মোতাবেক হাসমত সাহেব ছেলেটির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। কদম আলী তাকে ভুল বুঝেছে। এই ছেলেটির সাথে তিনি বিতর্ক করতে নারাজ নন তিনি আসলে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারটিকে অসম্ভব বলেছেন। স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য প্রয়োজনে তিনি রাতদিন বিতর্ক করবেন। কেবল বানর থেকে মানুষ নয় প্রয়োজনে তিনি নিজে মানুষ থেকে আবার বানর হয়ে বিবর্তনবাদকে প্রমাণ করে দেখাবেন। তবু হার মানবেন না। তার মনে কেবল একটি ভয়, একটি আতংক। যে সূত্রকে বুকে আগলে নাস্তিকতার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন আজ এই পুঁচকে ছেলেটি তা ধ্বংস করে দেবে না তো! হাসমত সাহেব নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করেন। এই পুঁচকে ছেলেটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি সম্পর্কে হয়তো কিছুই জানে না ফলে তার পক্ষে সেটা খন্ডায়ন করা সম্ভব নয়। অতএব, তিনি বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেন। প্রস্তুতি বলতে পকেট থেকে একটা চশমা বের করে চোখের উপর রাখা আর নিজের চেয়ারটিতে একটু আরাম করে বসা। চশমা ছাড়া তিনি আবার ভাল চোখে দেখেন না। বিতর্কের জন্য চোখে দেখা শর্ত নয় মুখে বলতে পারলেই হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের চেহারা ভালভাবে দেখতে না পারলে তার মনের ভাবও বোঝা যায় না। এতে বিতর্কের মূল আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। প্রস্তুতি শেষ করে তিনি শহিদকে লক্ষ্য করে বলেন,

- ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?

কদম আলী সঠিক কথাই বলেছেন। শহিদ ভীষণ মেধাবী ও ব্রিলিয়ান্ট। সে বুঝতে পারে বিতর্কের প্রথম প্রহর শুরু হয়েছে। উভয় পক্ষের বয়সের ব্যবধানকে কমিয়ে আনা এবং প্রতিপক্ষের সামনে নিজের গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য যথাসম্ভব

ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে সে বলে,

- ডারউইন যতটুকু বলেছেন ততটুকুই জানি।

সিনেমার নায়কদের মতো নিজেকে প্রকাশ করার এই নিপুন পদ্ধতিটি হাসমত সাহেবের পছন্দ হয় ঠিকই কিন্তু প্রতিপক্ষের মন্তব্যের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন না করে সেটাকে খন্ডায়ন করাই বিতর্কের নীতি। তিনি খুব দৃঢ়ভাবেই এই নীতিতে বিশ্বাস করেন। স্কুল জীবন থেকে বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং এই নীতি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন। একটা সুস্পষ্ট বক্তব্যকে কিভাবে অস্পষ্ট করে দেওয়া যায় সেটা তার জানা আছে। তার স্পষ্ট মনে আছে একবার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকরা বিতর্কের বিষয় ঠিক করেছিলেন "গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু"। সবাই একমত হয়ে তাদের দলকে এই শিরোনামের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য করেন। হয়তো তারা হাসমত সাহেবের অপরাজেয় টিমকে একবারের জন্য হলেও পরাজিত করতে চেয়েছিলেন অথবা তারা স্রেফ মজা দেখার জন্য এমনটি করেছিলেন। পক্ষের ছেলেরা গাছের বিভিন্ন উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে "গাছ উপকারী বন্ধু" বক্তব্যটি প্রমাণ করছিল। গাছ অক্সিজেন দেয়, গাছ থেকে আমরা ফল পায়, গাছ কেটে কাঠ হয় ইত্যাদি। এদের ঘায়েল করার জন্য হাসমত সাহেবে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি শাব্দিক জটিলতা সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন,

- বন্ধুরা আপনাদের তথ্য গুলো সত্য বটে কিন্তু আপনাদের মন্তব্য সঠিক নয়। বোঝাই যাচ্ছে বাঙালী হয়েও বাংলা ভাষায় আপনারা পুরোপুরি অজ্ঞ এবং অদক্ষ। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলব, যে উপকার করে তাকে বলা হয় উপকারী। এমন ব্যক্তিকে বন্ধুও বলা চলে। যার নিকট থেকে জোর করে উপকার গ্রহন করা হয় তাকে উপাকরী বন্ধু বলে না তাকে বলে অনুগত সেবক। বন্ধুকে কেউ নিজেকে সেবা করতে বাধ্য করে না। বন্ধুর গলা কেটে নিজের উপকারে লাগাই না। কিন্তু আমরা গাছ কেটে কাঠ করি। সেই কাঠ দিয়ে খাট-পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল তৈরী করি। কাঠকে খড়ি করে আগুণে পুড়িয়ে হাড়ি হাড়ি খাবার রান্না করি। বন্ধুর সাথে কি কেউ এহেন আচরণ করে! তাই বলব, একগুয়েমী করে একথা আর বলবেন না যে, "গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু" বরং আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে বলুন, "গাছ আমাদের অনুগত সেবক।" তার বক্তব্যের পর দর্শকদের হাত তালি আর থামে না। বিচারকও শেষ মেষ তাদের পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হন। এধরণের একজন কৌশুলী তার্কিকের পক্ষে শহিদের গর্ব মিশ্রিত মন্তব্যটির মধ্যে অসংলগ্ন কিছু খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। হাসমত সাহেব তেমন কিছু পেয়েও গেলেন, ঠোটের কোনে হালকা হাসি মাখিয়ে বললেন,

- কেবল ডারউইন যতটুকু বলেছে ততটুকু জানলে হবে না। ডারউইন যা বলে নি তাও জানতে হবে।

শহিদ বুঝতে পারে এই কথাটির কোনো অর্থ নেই। বিতর্কের সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই। তার্কিক লোকেরা এধরণের মন্তব্যের মাধ্যমে কেবল গোলোযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এই গোলোযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাসমত সাহেবকে বিব্রত করার মাসনে শহিদ বলে,

- ডারউইন যা বলেনি তাকে কি ডারউইনের বিবর্তনবাদ বলা যায়?

কথাটি শুনে হাসমত সাহেব বেশ গোলোযোগে পড়ে যান। কেউ যা বলেনি তা তার নামে চালিয়ে দেওয়া একদিকে যেমন অন্যায় অন্য দিকে হাস্যকর ব্যাপারও বটে। এর অর্থ হলো হাসমত সাহেবে একটি হাস্যকর মন্তব্য করেছেন। বিতর্কের মজলিসে হাসির পাত্রে পরিণত হওয়ার চেয়ে অধিক লজ্জার আর কিছু নেই। হাসমত সাহেব এবার মূল বিষয়টি সরাসরি উপস্থাপণ করেন,

- তুমি কি প্রকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে কিছু জানো?

- জী, জানি। এটা ডারউইনের বিবর্তনবাদের একটি মৌলিক সূত্র। এর অর্থ হলো, প্রকৃতিক নিয়মে অধিক যোগ্য প্রাণী টিকে থাকে আর অযোগ্য প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে স্বয়ংক্রিয় পন্থায় ধীরে ধীরে সুযোগ্য প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন ধরুন, বিবর্তনের মাধ্যমে বহু সংখ্যক প্রাণী তৈরী হলো যাদের কারো একটি হাত, কারো দুটি হাত কেউ আবার হাত বিহীন। প্রকৃতির বুকে সংগ্রাম করে এদের মধ্যে কেবল অধিক যোগ্য প্রাণী তথা দুই হাত ওয়ালা প্রাণীটি টিকে থাকবে আর অযোগ্য ও অদক্ষ প্রাণীগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। অর্থাৎ প্রকৃতিকভাবে তথা এমনি এমনই বহু সংখ্যক অযোগ্য প্রাণীর মধ্যে যাচাই-বাছায়ের মাধ্যমে একটি যোগ্য প্রাণীর উদ্ভব ঘটা।

শহিদের ব্যাখ্যা শুনে আতংকে হাসমত সাহেবের অন্তরআত্মা হিম হয়ে আসে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, এই সূত্রটির পরের অংশটির ব্যাখ্যাও ছেলেটা জানে। তবু কৌতুল নিবৃত করতে না পেরে তিনি প্রশ্ন করেন,

- প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ অনুযায়ী মাধ্যমে কিভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টি হওয়া বিষয়িটর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তা কি তুমি জানো?

শহিদ মাথা নাড়ে, সে বিষয়টি জানে। সে কি বলবে তা শুনার জন্য হাসমত সাহেব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রেখে শহিদ বলে,

- নাস্তিকরা যখন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে তখন আমরা বলি, যদি স্রষ্টা না থাকবে তবে আমরা চোখের সামনে যা কিছু দেখি সেগুলো কিভাবে সৃষ্টি হলো? এত সুন্দর আকার আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ, শ্রবন, দর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হলো? প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই সূত্র অনুসারে নাস্তিকরা এখন এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে, একটি বুদ্ধিমান ও দক্ষ প্রাণী হঠাৎ করে পৃথিবীতে আসেনি বরং প্রকৃতিতে দক্ষ-অদক্ষ, যোগ্য-অযোগ্য ইত্যাদি নানা রকম প্রাণীর সংমিশ্রণে বহু সংখ্যক প্রাণী এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছিল। তার পর একটি প্রাণী থেকে কিছুটা পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে আরও বহু সংখ্যক বিভিন্ন দোষ-গুণ মিশ্রিত প্রাণী যুগের পর যুগ ধরে সৃষ্টি হয়ে আসছে। সেগুলোর মধ্যে দক্ষ ও যোগ্য প্রাণিগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে তথা এমনি এমনি টিকে গিয়েছে আর অদক্ষ ও অযোগ্য প্রাণীগুলো বিলীন হয়ে গেছে। আমরা এখন দক্ষ ও যোগ্য প্রাণীটিকে দেখছি আর বলছি এত দক্ষতা তাকে কে দিয়েছে? নিশ্চয় কোনো স্রষ্টা তাকে এগুলো দিয়েছে। অথচ তার মধ্যে এই দক্ষতাগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবে এসেছে, কোনো স্রষ্টার পরিকল্পণার মাধ্যমে নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ধরে নিই একজন ব্যক্তির এক কেজি ওজনের পাঁচটি পাথর প্রয়োজন। সে পাহাড়ের পাশে পাথর খুঁজার জন্য গেলো। যদি দেখা যায় সেখানে কেবল পাঁচটি পাথর রয়েছে যার প্রত্যেকটির ওজন এক কেজি। কোনো পরিকল্পণা ছাড়াই এমনি এমনি এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এমন মনে করা স্বাভাবিক যে কেউ একজন এই ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পর্কে জেনে পাঁচটি এক কেজি ওজনের পাথর রেখে গেছে। কিন্তু যদি দেখা যায় পাহাড়ের নিচে লক্ষ লক্ষ পাথর পড়ে আছে আর এই ব্যক্তি তার মধ্য থেকে পাঁচটি এক কেজি ওজনের পাথর বাছাই করে নেয় তবে এটা আশ্চর্যের ঘটনা নয়। এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই যে, কেউ একজন পরিকল্পনা করে এক কেজি ওজনের পাথরগুলো রেখে গেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটনাটি কোনো পরিকল্পণা ছাড়াই এমনি এমনি ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, আমরা এখন যেসব প্রাণী দেখছি সেগুলো পৃথীবীতে একমাত্র প্রাণী নয় বরং অনেক প্রাণীর মধ্য থেকে প্রকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাছায় হয়ে এগুলো প্রকৃতির বুকে টিকে আছে। সুতরাং এসব প্রাণীর অস্তিত্বের পিছনে কোনো পরিকল্পণা বা স্রষ্টা থাকা শর্ত নয় বরং এগুলো প্রকৃতিক নিয়মে এমনি এমনিও অস্তিত্বশীল হতে পারে।

হাসমত সাহেব এখন বুঝতে পারছেন শহিদের দাবীটি মোটেও অতিরঞ্জন নয়। আসলেই সে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। শুধু জানে তাই নয় উত্তমভাবে বুঝাতেও পারে। এভাবে তিনি নিজেও কাউকে বুঝাতে পারবেন না। এরপর তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন- “এই ছেলে যদি বিবর্তনের বিরুদ্ধে কথা বলে তবে তো

তাকে তিনি বিতর্কে পরাজিত করতে পারবেন না।" এখন তিনি কি করবেন? তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। শহিদকে লক্ষ্য করে বলেন,

- তুমি তো দেখি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানো। এক কাজ করতে পারো, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটা বই লিখে ফেলো। আমি নিজে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে বইটির জন্য বিশিষ্টজনদের বাণী সংগ্রহ করে দেবো। বাজারে ছাড়লে বইটির খুব চাহিদা হবে, তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

বিখ্যাত হওয়ার কথা শুনে শহিদ হেসে ফেলে। মাস্টার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে,

- কিসের লোভে পড়ে মানুষ বিবর্তনবাদের পক্ষে কথা বলছে তা কি এখন বুঝতে পারছেন?

কদম আলী মৃদভাবে মাথা ঝাকান। তিনি এখন ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন। শহিদ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হাসমত সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে,

- আমার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

হাসমত সাহেবের বুকের ভিতরটা আতংকে কুকড়ে ওঠে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন এখন ডারউইনের প্রস্তাবিত এবং তার নিজের অন্তরে বছরের পর বছর ধরে প্রতিপালিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি বাতিল প্রমাণ করা হবে। তিনি চোখের চশমাটি খুলে টেবিলের উপর রাখেন। এই মূহুর্তে প্রতিপক্ষের চেহারায় কেবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ আর অন্তরে বিজয়ীর মনোভাব। আপাতত এটা তার দেখতে ইচ্ছা করছে না। চশমাটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শহিদ বলতে শুরু করে,

- প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটির মধ্যে ডারউইন বেশ বড় রকমের বোকামী করেছেন। তিনি খুব সরলভাবে চিন্তা করেছেন। আমরা এক কেজি ওজনের একটি পাথরের উদাহরণ উল্লেখ করেছি। এই উদাহরণটি খুবই সহজ সরল। যেহেতু এখানে পাথরের কেবল একটি বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে আর তা হলো এটির ওজন। একটি বৈশিষ্টের পরিবর্তে দুটি বা চারটি বৈশিষ্টের কথা চিন্তা করলে উদাহরণটি জটিল হয়ে যাবে। ধরুন একজন ব্যক্তি পাহাড় দেখতে যাবে। সে রাস্তা চেনে না তবে তার যাত্রাস্থান থেকে পাহাড়ের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত রাস্তা আছে মাত্র একটি। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এই ব্যক্তি কাউকে প্রশ্ন না করেও সহজেই রাস্তা চিনে পাহাড়ে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু যদি রাস্তার মাঝখানে তিন রাস্তার মোড় থাকে তবে ব্যাপারটি জটিল হয়ে যাবে। এধরণের মোড় যদি কয়েকটি থাকে তবে তো অবস্থা আরও খারাপ এমতাবস্থায় কাউকে প্রশ্ন না করে রাস্তা চিনে নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। কেবল ১ কেজি ওজনের একটি পাথর খুঁজে বের করা একমুখী রাস্তায় চলার

মতই সহজ-সরল তাই লক্ষ্য লক্ষ্য পাথরের মধ্যে এধরণের দু'চারটি পাথর আবিষ্কার করা অসম্ভব মনে হচ্ছে না। কিন্তু এর সাথে যদি আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয় তবে ব্যাপারটি অসম্ভভ হয়ে দাড়াবে। ধরুন আমি এমন একটি পাথর বা লৌহ খন্ড খুঁজে বের করতে চাই যা আমাদের সময়ে প্রচলিত বাটখারার মতো চারকোনা হবে এবং তার উপর ইংরেজীতে ১ কেজি লেখা থাকবে তার নিচে কোম্পানীর নাম ও সীল থাকবে। কেবল লক্ষ্য লক্ষ্য বা কোটি কোটি নয়, সারা পৃথীবী এমনকি মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্রে তালাশ করেও কোনো পরিকল্পণা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী এমন একটি পাথর আবিষ্কার করা কি সম্ভব?

কদম আলী লক্ষ্য করলেন তার বন্ধুবর শুকনো কাঠের মতো স্থির হয়ে রয়েছে। মুখে কথা নেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো ইশারা ইঙ্গিত নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে তার মনোজগতে ঝড় চলছে। তিনি দার্শনিক মানুষ। সারা জীবন ধরে একটি দর্শনকে লালন করেছেন এখন সেটা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছেন। কিন্তু স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিকে তো আর অগ্রাহ্য করা যায় না! চশমাবিহীন চোখ দুটি একদৃষ্টিতে শহিদের চেহারার উপর মেলে আছেন। আবছাভাবে হলেও তিনি প্রতিপক্ষের মনোভাব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। শহিদের প্রশ্ন শুনে নিজের অজান্তেই তার মাথাটি ডানথেকে বায়ে সঞ্চালিত হতে থাকে।

- সম্ভব নয় কষ্মিনকালেও সম্ভব নয়।

সাড়া পেয়ে শহিদ উৎসাহ বোধ করে। আলতোভাবে টেবিলে রাখা চশমাটি তুলে নেয়। হালকা চাপ দিয়ে চশমার ডান দিকের কাচটি ফ্রেম থেকে বের করে আনে। কদম আলী বিস্ময়ের সাথে তার কর্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন আর বন্ধুর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু হাসমত সাহেব কিছুই বললেন না। হয়তো দৃষ্টি শক্তির দূর্বলতার কারণে তিনি ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নি অথবা শহিদের মতো তিনিও জানেন যে কাচটি যেভাবে সহজে খুলে ফেলা যায় আবার লাগানোও যায়। চশমার খোলা কাচটি হাতে নিয়ে শহিদ বলে,

- এই কাঁচটির দিকে লক্ষ্য করুন। কাঁচটির বৈশিষ্ট্য হলো, চশমার ফ্রেশের সাথে মিল রেখে চারপাশ থেকে মশ্রিণভাবে কাঁচটিকে কাঁটা হয়েছে। এখানে কেবল দুটি ব্যাপার। চারপাশ থেকে মশ্রিণভাবে কাঁটা আর চশমার ফ্রেমের সাথে মিল রাখা। যদি দুনিয়ার সকল কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয় এবং সেই লক্ষ কোটি ভাঙা কাঁচের টুকরার মধ্যে হুবহু এই রকম একটি কাচ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তবে সেটা কি সম্ভব?

হাসমত সাহেব নিরব থাকেন। তিনি লক্ষ্য করেন, তার অন্তরের গভীর থেকে ভীষণ

সুক্ষ্ম একটা বেদনা উৎলে উঠছে। তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তার নিরবতা শহিদের পছন্দ হয় না। উভয়পক্ষের অংশগ্রহণ ছাড়া বিতর্ক জমে না। তাকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার জন্য সে বলে,

- আপনার চশমার পাওয়ার কত?

- দুইশ পঞ্চাশ।

অনেকটা অবচেতনভাবে কথাটি বলেন হাসমত সাহেব। তিনি নিশ্চিত জানেন এই উত্তরটিও তার বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ঠিক তাই ঘটলো। উত্তরটি শোনার সাথে সাথে শহিদের দরাজ কণ্ঠ শোনা গেল।

- লক্ষ কোটি কাচের খন্ডের মধ্যে আপনাকে যে কাচটি খুঁজতে বলা হয়েছিল যদি বলা হয় সেটার পাওয়ার হতে হবে, দুইশ পঞ্চাশ কোনো কারিগরের প্রচেষ্টা ছাড়াই কেবল প্রকৃতিতে ঘটমান স্বাভাবিক ঘটনার মাধ্যমে এমন একটি কাঁচ কি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?

হাসমত সাহেবকে এবার মুখ খুলতেই হলো,

- সম্ভব নয়, কখনও সম্ভব নয়।

- দেখুন প্রাণ সৃষ্টির বিষয়টি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল ও সুক্ষ্ম। চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বাদ দিয়ে যদি অতি সরল একটি প্রাণীর কথা কল্পণা করা হয় যার একটি মাত্র কোষ রয়েছে তবু বলতে হয় এটা এমনি এমনি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। একটি কোষের গঠন বিন্যাস মোটেও সরল-সোজা নয়। বিষয়টি চশমার কাচের চেয়ে অনেক বেশি সুক্ষ্ম এবং প্রতিটি প্রাণীর ডি,এন,এ তে যে তথ্য থাকে তা একটি বাটখারার উপরে লেখা কোম্পাণীর নাম ও সীলের তুলনায় ঢের বেশি। কোনো পরিকল্পণা ছাড়াই এটা হঠাৎ সৃষ্টি হতে পারে না। এক কেজি ওজনের একটি পাথর খুঁজে বের করা বা এই প্রকৃতির সরল উদাহরণের সাথে বিষয়টিকে তুলনা করা সুস্পষ্ট বোকামী ছাড়া কিছু নয়।

হাসমত সাহেব প্রাণীবিদ্যার শিক্ষক। কোষের গঠনপ্রণালী বা ডি,এন,এ সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। শহিদের কথার সত্যতা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধী করতে পারছেন। তবু বিতর্কের নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ের শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি একগুয়েমীর আশ্রয় নিলেন। নিরেট নির্বোধের মতো চিৎকার করে বললেন,

- আমি কোষ মানি না, ডি,এন,এ মানি না। ধরে নাও আমি একজন সাধারন মানুষ। প্রাণ সৃষ্টি হওয়া যে জটিল বিষয় সেটা তুমি আমাকে কিভাবে বোঝাবে?

তার কথা শুনে কদম আলীর মুখ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। তার মনে হয় এতক্ষণে লোকটির নামের সাথে কাজের মিল পাওয়া যাচ্ছে। যে কোষ মানে না, ডি,এন,এ মানে না সে পাগল ছাড়া আর কি! শহিদ অবশ্য অবাক হয় না। সে জানে নাস্তিকরা এমন একগুয়েই হয়ে থাকে। হালকা হেসে উঠে সে বলে,

- আপনাকে কোষ বা ডি,এন,এ কিছুই মানতে হবে না। তবে অতি সাধারন কিছু যুক্তি তো মানবেন?

হাসমত সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়েন। সাধারন যুক্তি তাকে মানতেই হবে। যে সাধারন যুক্তি মানে না সে উন্মাদ। তাকে সম্মতি দিতে দেখে শহিদ বলতে শুরু করে,

- আমরা দেখেছি কোনো কিছুর মধ্যে একটিমাত্র সরল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া সহজ। কিন্তু একই সাথে দুইটি, তিনটি বা কয়েকটি সুক্ষ্ম বিষয় একত্রিত হওয়া অসম্ভব। একারণে কোম্পানীর নাম ও সীল লেখা একটা পাথর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হয় না এবং লক্ষ্য লক্ষ্য কাচ খন্ডের মধ্যে চমশার ফ্রেমের মাপে সুন্দর করে কাঁটা নির্দিষ্ট পাওয়ার বিশিষ্ট একটি কাচ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। লক্ষ্যণীয় হলো, প্রাণ বলতে কমপক্ষে তিনটি জটিল বিষয়ের সংমিশ্রণকে বোঝায়-

প্রথমতঃ একটি প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে একটি যান্ত্রিক শক্তি কাজ করে যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে, বড় হয়, নিজের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন রক্ত বা খাবার-পানি স্থানান্তর করে ইত্যাদি। এর জন্য প্রয়োজন শিরা-উপাসিরা, অস্থি-মজ্জা, হৃদপিন্ডের স্পন্দন ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়ার।

দ্বিতীয়ত- একটি প্রাণির ভিতর যে যান্ত্রিক শক্তি রয়েছে সেটা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এবং নিজেকে প্রাণী হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে বাহির হতে খাদ্য গ্রহণ করে সেটা নিজের দেহের ভিতরে রাখার জন্য একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি থাকতে হবে। যেমন মানুষের হাত-পা মুখ, খাদ্যনালী ইত্যাদি রয়েছে। মাটি হতে পানি শুষে নিয়ে শাখা-প্রশাখা এবং পাতায় পাতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাছের রয়েছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী যান্ত্রিক পদ্ধতি। সেই সাথে রয়েছে বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার পদ্ধতি। খাদ্য গ্রহন করার পর নিজের শরীরে সেটা কিভাবে কাজে লাগানো হবে তার জন্যও রয়েছে নির্দষ্ট পদ্ধতি। গৃহিত খাদ্যের যতটুকু অবশিষ্ট থাকে তা বর্জ্য হিসেবে নিষ্কাষণ করার ব্যাবস্থাও একান্ত জরুরী।

তৃতীয়তঃ নিজের অস্তিত্বকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে হলে কেবল নিজের শরীরকে টিকিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয় বরং সেই সাথে প্রয়োজন বংশবৃদ্ধি করার। প্রতিটি প্রাণীর

তাই বংশবৃদ্ধি করার সক্ষমতা থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করার পদ্ধতির মধ্যেও যথেষ্ট জটিলতা ও সুক্ষতা রয়েছে।

একটি প্রাণীর মধ্যে যে এই তিনটি গুণাবলী উপস্থিত থাকতে হবে সাধারন যুক্তিতেই তা বুঝা যায়। কোষ দেখতে অনুবিক্ষণ যন্ত্র লাগে কিন্তু এগুলো বুঝার জন্য খালি চোখই যথেষ্ট। তাই নয় কী?

হাসমত সাহেব সম্মতি প্রদান করেন। তিনি চশমা বিহীন চোখেও এগুলো অনুধাবন করতে পারছেন। শহিদ বলে,

- তাহলে প্রাণী বলতে বোঝায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী যান্ত্রিক শক্তি যার রয়েছে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা, যান্ত্রিক শক্তিকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা খাবার-পানি গ্রহণ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং নিজের প্রতিলিপি তৈরী করে বংশ রক্ষা করার পদ্ধতি। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রথম যে প্রাণিটি সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে এই তিনটি জিনিসের কোনোটি অনুপস্থিত থাকলে তার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ সম্ভভ হতো না। প্রশ্ন হলো একটি কাঁচ বা পাথরের মধ্যে যেখানে সাধারন কয়েকটি শর্ত এমনি এমনি একত্রিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেখানে সুক্ষ্ম কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্বলিত একটি জটিল যন্ত্র কিভাবে এমনি এমনি তৈরী হতে পারে!

হাসমত সাহেব কিছুক্ষণ নিরব থাকেন তারপর হঠাৎ উপর থেকে নিচে জোরে জোরে মাথা ঝাকাতে শুরু শুরু করেন। আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন,

- তোমার কথাই ঠিক। একদম ঠিক। এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এ মতবাদ ভ্রান্ত। ডারউইন ভুল করেছেন। কেবল ভুল নয়, তিনি বোকামী করেছেন।

কথাগুলো বলে আবার নিরব হয়ে যান প্রফেসর সাহেব। তিনি কি ভাবছেন বোঝা গেলো না তবে বোঝা যাচ্ছে নিজের সাথে নিজে সংগ্রাম করছেন। হয়তো ভাবছেন- স্রষ্টার সামনে কি হিসাব দেবেন! শহিদ এক নজরে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কিছুক্ষণ জড় বস্তুর মতো নির্জীব থেকে হঠাৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে লোকটি? এতক্ষণ সব কাজের কথা ভুলে বসে ছিলেন তিনি। এখন তার মনে পড়েছে আজ সাড়ে এগারটায় কলেজে একটা ক্লাস ছিল। এখন কটা বাজে কে জানে? এটা ভাবতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বাম হাতটি উপরে উঠে আসে আর চোখ দুটি ঠিকরে তিনি দৃষ্টি রাখেন ঘড়ির কাটাগুলোর দিকে। ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে, কাটাগুলোও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কিন্তু কটা বাজে তা বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি অনুমান করতে কিছুক্ষণ সময় লাগে তার। পরে যখন ব্যাপার বুঝতে পারলেন ছো মেরে টেবিল থেকে চশমাটি

তুলে নিয়ে চোখে ভরে আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এবারও দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি স্বাভাবিক হলো না। গোলোযোগ একটা রয়েই গেছে। তবে কি তার দৃষ্টিশক্তি আরও খারাপ হয়ে গেলো! ঠিক তখনই শহিদের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

- কাচটি ফ্রেমে ভরে নিন।

কথাটি বলে শহিদ ডান হাত দিয়ে খোলা কাচটি উঁচু করে ধরে। প্রফেসর সাহেব কাচবিহীন ফ্রেমের ভিতর দিয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। এতক্ষণে তিনি প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে পারেন। নিজে হাতে কাচটি গ্রহণ করার পরিবর্তে চশমার ফ্রেমটি শহিদের দিকে এগিয়ে দেন। শহিদ পরম যত্নে ঠেসে ঠেসে কাচটি যথা স্থানে স্থাপণ করে চশমাটি তাকে ফিরিয়ে দেয়। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফ মেরে দাড়িয়ে যায় বয়স্ক মানুষটি। এখন প্রায় বারোটা বাজে। তিনি বুঝতে পারেন, আজ তার ক্লাসের বারোটা বেজে গেছে। চেয়ার থেকে দাড়িয়ে তিনি আরও একটি বিষয় বুঝতে পারেন। খিদেয় তার পেট চো চো করছে। সকালের নাশতা তিনি একটু দেড়িতেই করেন। কলেজে যাওয়ার পথে রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে নেন। আজ বাড়ি থেকে বের হবার আগেই মেহমানরা হাজির হয়েছে। তাদের কারণেই তার খাওয়া হয়নি। একারণে মেহমানদের উপর তার রাগান্বিত হওয়ার কথা কিন্তু তার রাগ হচ্ছে না উপরন্তু মেহমানদের তিনি যে এখনও আপ্যায়ন করেননি একারণে তার লজ্জা বোধ হচ্ছে। নিজেকে স্থির করে হাসমত সাহেব কদম আলীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন,

- আরে তোদের তো কিছুই খাওয়ায়নি এখনও।

এবার কদম আলীও ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অনুনয় করে বলেন,

- আমাদের কিচ্ছু খাওয়ার দরকার নেই। আমরা খেয়েই বের হয়েছি।

কথাটি বলে শহিদের দিকে দৃষ্টি ফেরান তিনি। যেনো এ ব্যাপারে তার সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করছেন। শহিদ কয়েকবার মাথা ঝাকিয়ে বলে,

- জী হ্যাঁ। আমরা খেয়েই বের হয়েছি।

প্রফেসর সাহেব আর এক চুল সময় নষ্ট করতে প্রস্তুত নন। তিনি শহিদের হাত ধরে টানতে টানতে লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে এলেন। নিজের ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে। দুজনকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলেন। রাস্তার পাশের ফুটপাত ধরে পায়ে হেটে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিন রাস্তার মোড়ে যে বড় রেস্টুরেন্টটি ছিল তারা সেখানে ঢুকে একটি টেবিলকে ঘিরে বসে পড়ল। ইতোমধ্যে সেখানে কর্মরত একজন অল্প বয়সী যুবক খাবারের মেনু জানার জন্য প্রশ্ন করে। চি চি করে হাসমত

সাহেব যে নামটি উচ্চারণ করলেন তার আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারে না শহিদ। শুধু বস্তুটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার হাজির হয়ে যায়। কিছু নরম তুলতুলে রুটি আর একটা ঝোল সদৃশ বস্তু যা দেখতে কাচা ডিমের গোলার মতো। দেখে শহিদের গা গুলিয়ে আসে। নিজের খাওয়া শুরু করার আগে সে অপর দুজনের কার্যকলাপ ভালভাবে লক্ষ্য করে। প্রফেসর সাহেব ইতোমধ্যে একটুকরো রুটিতে ঝোল মিশিয়ে মুখে ভরে ফেলেছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বেশ মজাই পাচ্ছেন। মাস্টার সাহেব সবে জামার আস্তিন গোটাতে শুরু করেছেন। বোঝা যাচ্ছে তিনিও বেশ মজা করেই খাবেন।

তারা দুজনেই এই খাবারের সাথে পরিচিত। যখন তারা কলেজে পড়তেন প্রায়ই এখানে এসে এই খাবার খেতেন। একজন আরেকজনকে খাওয়াতেন। কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পর এভাবে একত্রে আর কখনও এখানে আসা হয়নি। আজকের এই ঘটনা অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। কদম আলী নিরস মানুষ। এসব স্মৃতি তাকে দোলা দেয় না। কিন্তু হাসমত সাহেব সাহিত্যিক মানুষ। আজকের ঘটনা তাকে জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। স্মৃতির সমুদ্রে গা ভাসিয়ে তিনি তারুণ্য, কৈশর এমনকি শৈশব পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে তার জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি ভাবছেন কত আনন্দ-বেদনা আর নানা রকম ঘটনা দিয়ে এ জীবন সাজানো। কত জটিল এ সৃষ্টি!!

তিন.

এই ঘটনার পর প্রফেসর সাহেবের মনোবল ভেঙে যায়। এতদিন যাবৎ তিনি নিজের চিন্তা-দর্শন নিয়ে গর্ব করতেন। তিনি ভাবতেন আমি অকাট্য সত্যের উপর আছি যা খন্ডায়ন করার সামর্থ কারও নেই। এখন তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তার চিন্তা-দর্শন যে, ভুল তিনি এখনও তা মনে করেন না। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ ব্যাপারে তিনি এখন সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন। যুগের পর যুগ ধরে তিনি যে দর্শনকে অকাট্য সত্য হিসেবে অন্তরে লালন করেছেন কয়েক ঘন্টার আলোচনাতেই তাতে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। মনোবল দূর্বল হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি? এখনও পর্যন্ত তার মন মানসিকতা নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। তিনি নাস্তিকতার বিজয় চান, ধর্মের পরাজয় চান। কিন্তু তার নিজের ঝোলায় যা আছে তা দিয়ে নাস্তিকতাকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই। এখন তিনি পরিচিত সকল গ্যাঁড়া নাস্তিকদের একত্রিত করে তাদের মতামত নেবেন। তাদের সবাইকে তিনি এই পনের

বছর বয়সী ছেলেটির মুখোমুখি দাড় করাবেন। তার আশা এভাবে একযোগে হামলা করলে হয়তো ছেলেটিকে পরাজিত করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে তার যুক্তিকে খন্ডায়ন করা।

এ বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দিনই সন্ধ্যায় তিনি হাজির হোন মুক্তাঙ্গনে। মুক্তাঙ্গন হলো এলাকার সকল নাস্তিকদের মিলিত হওয়া ও মতবিনিময় করার উম্মুক্ত স্থান। এটা একটা পাঠাগারের মতো। বড় বড় তাক ভর্তি বই, বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পশ্চিম দিকের দেয়াল খোদায় করে ঝুলিয়ে রাখা একটা টিভি স্ক্রীন ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। কর্তৃপক্ষের ভাষায়- মানুষকে ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত করে নাস্তিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে এই পাঠাগার তৈরী করা হয়েছে, তাই এর নাম মুক্তাঙ্গন। কথিত আছে রাশিয়া থেকে এই পাঠাগারের ব্যায় নির্বাহ করা হয়। ঘটনা যাই হোক, এলাকার সকল নাস্তিকরা এই পাঠাগারে যাতায়াত করে। সেই সূত্র ধরে হাসমত সাহেবও মাঝে মাঝে সেখানে যান। তবে আজকের যাওয়াটা ভিন্ন প্রকৃতির। আজ তিনি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে। সেখানকার স্বঘোষিত নাস্তিক পন্ডিতরা এই চ্যালেঞ্জকে কিভাবে গ্রহণ করে সেটাই দেখার বিষয়।

মুক্তাঙ্গনে পৌঁছেই জনা দশেক বিভিন্ন বয়সের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলো। দেখা গেলো, তারা বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সব জ্ঞানের ভান্ডার পরিত্যাগ করে টিভি স্ক্রীনে বেশ জমকালো একটা বিদেশী সিনেমা নিয়ে মেতে আছে। উপস্থিত কেউ কেউ হাসমত সাহেবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মুচকি হেসে আবার বিনোদনে মনোনিবেশ করলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর কোনো একটাতে বসার আগেই নিজের চোখকে টিভি স্ক্রীনের উপর কিছুক্ষণ স্থির রাখেন হাসমত সাহেব। অনেকটা সুপারম্যান স্টাইলের একটা সিনেমা। সারি সারি বহুতল ভবন। একটা মুখোস পড়া লোক হুট হাট করে লাফ মেরে এ ছাদ থেকে ও ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সুযোগ মতো শত্রুদের ক্ষতম করছে। দর্শকরা যে যার মতো আনন্দ প্রকাশ করে তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। অকর্মণ্য লোকদের জন্য বিনোদনের সুন্দর একটা ব্যবস্থা তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যারা পান্ডিত্ব অর্জন বা প্রকাশ করার জন্য মুক্তাঙ্গনে আসে তাদের পক্ষে এসব কল্পিত বিনোদনে মেতে থাকাটা অবশ্যই শোভনীয় নয়। কল্পণায় গা ভাসিয়ে দিলে যুক্তি ভোতা হয়ে যায়, জ্ঞান লোপ পায়। অন্তত হাসমত সাহেবের ধারণা এটাই। তাই তিনি সিনেমার লোমহর্ষক কাহিনীতে নিজেকে মজাতে পারলেন না। বরং বিরক্ত হয়ে ঘরের এক কোনে টিভি স্ক্রীন থেকে যত দূরে সম্ভব বসার চেষ্টা করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন সিনেমাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা জমবে না। তাই অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তার অপেক্ষার প্রহর যেনো আর শেষ

হয় না। সিনেমাটি আসলেই অনেক লম্বা। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় হাসমত সাহেবের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। এক পর্যায়ে ভীষণ বিরক্ত হয়ে তিনি চলে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। আর ঠিক তখনই একটা অবাক কান্ড ঘটলো। হাসমত সাহেব চেয়ার থেকে উঠে পড়ার সাথে সাথেই দেখা গেলো উপস্থিত অন্যান্যরাও উঠে দাড়িয়ে গেলো। সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেলো টিভি স্ক্রীনটি। প্রথমে হাসমত সাহেবে ভীষণ বিস্মিত হোন। মনে মনে ভাবেন ঘরের সবাই কি তার সাথে তামাশা করছে! ঘটনা বুঝে নেওয়ার জন্য এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেলেন। ঘরের সব কিছু তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় তবে প্রবেশ দ্বারের কাছে একটা জটলা দেখা যায়। সম্ভবত কিছু নতুন লোক পাঠাগারে প্রবেশ করেছেন। হয়তো তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আছে যার সম্মানে অন্য সবাই দাড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যে দেখা গেলো, তাদের মধ্যে কেউ একজন ডান হাত দিয়ে সবাইকে বসে পড়তে আদেশ করছে। প্রফেসর সাহেব লোকটাকে চিনতে পারেন। তার নাম, ম. প. খোদা বখস। ম এবং প এর সম্পূর্ণ শব্দটি কি সে বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ সহজে এর ব্যাখ্যা করে বলেন, মহা পন্ডিত খোদা বখস। তিনি একজন মোটামুটি ধরণের গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এ ধরণের পাঠাগার দেশে বহু সংখ্যক রয়েছে। সেগুলোর দেখ ভাল করার জন্য কমিটি আছে। এই লোকটি সেই কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠাগার পরিদর্শন করা এবং পাঠাগারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া তার দায়িত্ব। অন্য কথায় বলা যায় তিনি মুক্তাঙ্গনের একজন কেন্দ্রীয় পন্ডিত। ঘটনাটা হাসমত সাহেবের নিকট অনেকটা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো মনে হলো। তিনি আজ যে উদ্দেশ্যে পাঠাগারে এসেছেন সে জন্য এ ধরণের একজন কেন্দ্রীয় পন্ডিতের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। তার সাথে কিভাবে কথা শুরু করবেন সেটা নিয়ে হাসমত সাহেব চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। তিনি শুনলেন কেউ একজন বলছে,

- এই যে মুরুব্বী, বসে পড়ুন।

হাসমত সাহেব এদিক সেদিক তাকিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন কে কাকে কথাটি বলছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন ঘরের আর সবাই বেশ কিছুক্ষণ আগেই বসে পড়েছে। দাড়িয়ে আছেন কেবল তিনি আর নতুন আগন্তুক যার ডান হাতটি তার দিকে ইঙ্গিত করে উপর থেকে নিচে নড়া চড়া করছে। সেই ইশারাকে অনুসরণ করে উপস্থিত সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। তিনি স্পষ্টত বুঝতে পারেন কথাটি তাকেই বলা হচ্ছে এবং কথাটি মুক্তাঙ্গনের কেন্দ্রীয় পন্ডিত নিজেই বলছেন। তার ভীষণ লজ্জা বোধ হলো সেই সাথে রাগও হলো। এই ব্যক্তি মহা পন্ডিত হলেও বয়সে তার চেয়ে কমপক্ষে পনের বছরের ছোট। কাগজ কলমে তার ডিগ্রীও অনেক

বড় হতে পারে কিন্তু হাসমত সাহেবও একজন প্রফেসর এবং নাস্তিকদের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তি। ঘরে আর যারা আছে তারা তাকে স্যার বলেই সম্মোধন করে। তাদের সবার বয়স তার ছেলের বয়সের মতোই। হাল আমলে নাস্তিকতার কিছুটা প্রচার প্রসার হলেও হাসমত সাহেবের সময় এদের সংখ্যা কমই ছিল। তাই তার বয়সী নাস্তিক খুঁজে পাওয়া দূরহ ব্যাপার। অতএব, এই ব্যক্তি যত বড় পন্ডিতই হোক তার সম্মানে দাড়িয়ে থাকা হাসমত সাহেবের শোভা পায় না। তিনি আসলে সে কারণে দাড়ানও নি। দাড়িয়েছেন চলে যাওয়ার জন্য। ঘরের এক কোনে বসে থাকার কারনে তার উঠা-বসা অন্যরা লক্ষ্য করেনি। তারা হয়তো লক্ষ্য করতোও না কিন্তু এই ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে কাকতালীয়ভাবে সবাই দেখলো প্রফেসর সাহেব এই নয়া পন্ডিতকে সম্মান দেখানোর জন্য দাড়িয়ে গেছেন। এমনকি সবাই বসে পড়ার পরও ঠাই দাড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদের চোখের দৃষ্টিতেও বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নিজের মনের মধ্যে বিরক্তি আর ক্ষোভ চেপে রেখে প্রফেসর সাহেব আপাতত বসে পড়লেন। সাথে সাথে পন্ডিত সাহেবও তার জন্য সংরক্ষিত চেয়ারটিতে বসে বেশ গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন।

- শতকরা ৯৫% মুসলমানের এ দেশে নাস্তিক হতে হলে আমাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে। সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে আমাদের চিন্তা-দর্শনকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। মৌলবাদীরা আমাদের শয়তানী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে লাঠি-সোটা নিয়ে প্রতিরোধের ঘোষণা দেবে কিন্তু আমাদের দমে গেলে চলবে না। পুরো সমাজকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ....

প্রফেসর সাহেব অতিথির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন কিন্তু মাথা তুলে তার দিকে দৃষ্টি দেননি একবারও। তীব্র ক্ষোভ আর অপমানবোধে তার অন্তরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। তবে তিনি আজকের এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না। তার সমস্যা নিয়ে এই বিজ্ঞ পন্ডিতের সাথে অবশ্যই আলোচনা করবেন। বক্তৃতা শেষ হলে একটা প্রশ্ন-উত্তরের ব্যবস্থা থাকার কথা। সেই সময়টুকুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পন্ডিত সাহেব যাচ্ছেতাই বক বক করে চলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে তিনি যথেষ্ট বাক পটু। তবে শ্রোতারা যে শ্রবনে পটু নয় তাও বোঝা যাচ্ছিল। বক্তৃতার সময় সবাই উসখুস করছিল। মওলানা সাহেবরা যেভাবে খোলা মাঠে ওয়াজ করে তেমন খোলা জায়গা হলে হয়তো সব লোক উঠে চলেই যেতো। বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে বাধ্য হয়েই মানুষ এই বিরক্তিকর বক্তব্য শুনছিল। তবে শেষে মানুষ এতটাই তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল যে বিষয়টি বক্তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলো। অবস্থা দৃষ্টে মানুষ বিদ্রোহ করার পূর্বেই তিনি বক্তৃতা শেষ করে দিয়ে বললেন,

- যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তবে নিঃসংকোচে তা পেশ করতে পারেন।

কথাটি শুনেই হাসমত সাহেব কিছু বলার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই ঘরের দক্ষিণ দিক থেকে একজন লোক উঠে দাড়িয়ে বলে,

- স্যার, কিছু মনে না করলে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

ম. প. খোদা বখস তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলে লোকটি বলে,

- নাস্তিক কয় প্রকার?

প্রশ্নটি শুনে পন্ডিত সাহেব বেজায় বিস্মিত হলেন। জীবনে অনেক প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু এধরণের প্রশ্ন তিনি কখনও শোনেন নি। কিছুক্ষণ নিরব থেকে আমতা আমতা করে তিনি বলেন,

- নাস্তিকরা কি আলু-পটল নাকি গরু-ছাগল যে তাদের বিভিন্ন প্রকার থাকবে?

দুই ঠোঁটের বা দিকটা কিঞ্চিত বাঁকা করে লোকটি বলে,

- আলু পটল বা গরু ছাগল যাই বলেন, সত্য কথা হলো, নাস্তিকরা সবাই একরকম না। এদের দুটি প্রকার আছে। এক প্রকার হলো খাঁটি নাস্তিক আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো মুনাফিক নাস্তিক।

এতদূর বলেই লোকটি থেমে গেলো। পন্ডিত সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেন,

- তা এই দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝিয়ে বলুন তো দেখি।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটি তাড়াহুড়া করে উত্তর দেওয়া শুরু করে।

- দেখুন খাটি নাস্তিক হলো তারা যারা মুখে যা বলে কাজে তাই করে। নিজেরা সম্পূর্ণভাবে ধর্ম এবং ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে দূরে থাকে আর মুনাফিক নাস্তিক হলো তারা যারা মুখে নাস্তিক হওয়ার দাবী করে কিন্তু কাজে কর্মে ধর্ম ধর্ম একটা ভাব রেখে চলে।

পন্ডিত সাহেব এখনও বিষয়টির আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারেন না। আলোচনাটা আরেকটু সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন,

- এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করুন তো দেখি।

উদাহরণের কথা শুনে লোকটি এবার বক্রভাবে হেসে বলে,

- এতক্ষণ যা বলেছি তা তো সবাই মানে কিন্তু উদাহরণ উল্লেখ করলেই ঘটে বিপত্তি। সবাই রেগে মেগে আগুন হয়ে যায়। তাই ইচ্ছা করেই এখন আর উদাহরন

উল্লেখ করি না।

কথায় বলে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষ বেশিই কৌতুহলী হয়। পন্ডিত সাহেবও তাই উদাহরনগুলো শোনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন,

- আমি কথা দিচ্ছি আপনার উপর কেউ রাগ করবে না আপনি নির্ভয়ে বলুন।

এই আশ্বাস পেয়ে লোকটি শুরু করে,

- অনেকে আছে নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করে কিন্তু জুময়া বা ঈদে ঠিকই টুপি মাথায় দিয়ে নামাজ পড়তে যায় হিন্দু হলে মন্দিরে যেয়ে পুজো করে কীর্তন শোনে। আপনিই বলুন এদের কি খাটি নাস্তিক বলা যায়!

লাইব্রেরীর স্থানীয় পরিচালক পন্ডিত সাহেবের পাশেই আছেন। তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এই প্রশ্নত্তোর শেষ হয় তার জন্য ততই মঙ্গল। তবে পন্ডিত সাহেব এখন এই ব্যক্তির আলোচনায় আগ্রহ বোধ করছেন বলেই মনে হচ্ছে। তিনি নিজেও বেশ গোঁড়া ধরনের নাস্তিক। ধর্ম-কর্ম একেবারেই পালন করেন না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও এড়িয়ে চলেন। যারা নিজেদের নাস্তিক পরিচয় দেওয়ার পরও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগ দেয় তিনি নিজেও তাদের খুব একটা পছন্দ করেন না। তাদের একটা খারাপ নাম দিয়ে গালা-গালি করাটা তার অনেক দিনের ইচ্ছা। কিন্তু সেটা কীভাবে করা যায় তা এতদিন বুঝতে পারেন নি। এখন এই ব্যক্তির কথা শুনে মনে হচ্ছে এদের মুনাফিক নাস্তিক বলে গালি দেওয়া যায়। বিষয়টি তার নিকট বেশ উপভোগ্য মনে হচ্ছে। দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করে বলেন,

- ও তাহলে এরাই হলো মুনাফিক নাস্তিক তাই না?

কথাটি বলে হালকা শব্দে হাসতে থাকেন তিনি। হাসমত সাহেব লক্ষ্য করেন কেবল পন্ডিত সাহেব হাসছেন। একেবারে শরীর দুলিয়ে হাসছেন। ঘরের আর কেউ হাসছে না। হাসমত সাহেব নিজেও হাসছেন না। কারন এর পরে এই ব্যক্তি আর যেসব কথা বলবে সেগুলো সম্পর্কে তারা জানেন। সেগুলো জানলে পন্ডিত সাহেবও হাসতেন না। হাসতে পারতেন না। লোকটি এবার সেই কথাগুলোই শুরু করে,

- আরেক দল লোক আছে, যারা নামাজ-রোজা, পূজা-উপাসনা কিছুই করে না কিন্তু অন্য দিক থেকে ধর্ম আর সমাজকে ঠিকই মেনে চলে।

এই কথাটি পন্ডিত সাহেবের কাছে খুব জটিল মনে হয়। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন,

- নামাজ-রোজা, পূজা-উপাসনা না করেও ধর্ম আর সমাজকে মেনে চলে! এটা কীভাবে সম্ভব?

এত বড় মহা পন্ডিত এই ছোট ব্যাপারটি জানে না দেখে বেশ গর্ব প্রকাশ করে লোকটি বলে,

- সম্ভব, পন্ডিত সাহেব সহজেই সম্ভব। এই যেমন ধরুন, আপনি কি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবেন?

কথাটি শুনেই পন্ডিত সাহেব চমকে ওঠেন। নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন,

- তওবা, তওবা। আপনি এসব কি বলছেন! মেয়েকে কি কেউ বিয়ে করে?

লোকটি খুব স্বাভাবিক ভাবে বলে,

- ধরুন আপনার স্ত্রী মারা গেছে, রেখে গেছে কেবল ১৮ বছরের একটি মেয়ে। আর আপনার মেয়ে যে কারনেই হোক আপনাকে বিয়ে করতে পুরোপুরি রাজি। পরের ঘরে কার কাছে গিয়ে লাঞ্চনা গঞ্জনার শিকার হবে তার চেয়ে নিজেই বিয়ে করে তাকে ঘরে রেখে দেওয়াটাই উত্তম নয় কি?

পন্ডিত সাহেব এই নিকৃষ্ট প্রস্তাব থেকে যে কোনো মূল্যে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে বলেন,

- রাখুন আপনার লাঞ্চনা-গঞ্জনা। জাহান্নামে গেলেও এ কাজ করা যাবে না। ছিঃ ছিঃ।

লোকটি এবার গর্জে ওঠে,

- আপনি ছিঃ ছিঃ বলে যে ঘৃণা প্রকাশ করছেন সেটা কি ধর্মের অংশ নয়? বাবা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না এটা তো ধর্মের আইন। ধর্মীয় কিতাবাদিতে এসব লেখা আছে। যারা ধর্ম মানে না। মানুষকে কেউ সৃষ্টি করেছে এটা বিশ্বাস করে না তারা এ আইন কেনো মানবে? যারা মনে করে মানুষ পশু থেকে সৃষ্টি হয়েছে তারা পশুর মতোই নিজের মা বা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করাটাকে ঘৃণা করবে কেনো? আশা করি বিষয়টি আপনি ভেবে দেখবেন।

পন্ডিত সাহেব এখনও বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি নাস্তিক হয়েছেন কিন্তু পশু হতে চান না। তবে এখন তার কাছে মনে হচ্ছে দুটো একই জিনিস। এই মুহূর্তে তিনি পান্ডিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করেন।

- দেখুন বিজ্ঞান বলে, নিজের আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ করলে প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম নেয়। একারণে ....

প্রতিপক্ষ উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল।

- আপনি কেবল বিয়ে করবেন, সন্তান নেবেন না। ধরুন, জন্ম নিরোধের স্থায়ী

কোনো বন্দোবস্তো করে নেবেন।

একমাত্র যুক্তিটি ধরাসায়ী হয়েছে দেখে পন্ডিত সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন। একটু উদাস ভাবেই বলেন,

- এটা তো ভীষণ নিন্দনীয় কাজ, একাজ করলে সমাজের মানুষে খারাপ বলবে।

লোকটি এবার শ্লেষ মিশ্রিত হাসি হেসে বলে,

- আপনি যে ধর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়েছেন একারণে সমাজের লোক আপনাকে খারাপ বলে নি? মোল্লা মৌলবীরা আপনার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে নি? তাহলে এখনই নাস্তিকতা পরিত্যাগ করে মোল্লা হয়ে যান।

পন্ডিত সাহেব বেশ ফাপড়ে পড়ে গেলেন। এই লোকের মুখে বিশ্রী কথাটা শুনে তার মাথাটা টন টন করছে। তিনি লোকটাকে বাঁধাও দিতে পারছেন না। তিনিই তো মানুষকে মুক্ত যুক্তির অনুসরণ করা শিখিয়ে বেড়ান এখন নিজেই তার বিরুদ্ধে কিভাবে বলবেন। তাই অনেকটা অনুনয় করে তিনি বলেন,

- আপনি ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গে কথা বললে আমি খুশি হবো।

লোকটি একটু আশাহত হয়ে আবার শুরু করে,

- ঠিক আছে এবার তাহলে ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। কিছু লোক নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করে কিন্তু ধর্মীয় নাম রাখে।

ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা প্রবাহিত হয়েছে দেখে পন্ডিত সাহেব আবার উৎসাহ ফিরে পেয়েছেন বলে মনে হলো। একটু টেনে বললেন,

- ধর্মীয় নাম? এটা আবার কি?

- এই যেমন ধরুন, আপনার নামটা।

পন্ডিত সাহেব চমকে ওঠেন। তার নামের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে এটা আগে ভাবেন নি। একটু স্বাভাবিক হয়ে বলেন,

- আমার নামে কি হয়েছে?

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ থাকে। সম্ভবত কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করে তারপর বলে,

- আপনার নাম খোদা বখস। এটা ফার্সী ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। খোদা মানে আল্লাহ বা স্রষ্টা আর বখস মানে দান। সুতরাং আপনার নামের অর্থ আল্লাহর দান।

আপনি স্রষ্টাকে স্বীকার করেন না অথচ নাম রেখেছেন খোদা বখস। অতএব, আপনিও একজন মুনাফিক নাস্তিক। আপনাকে খাঁটি নাস্তিক হতে হবে।

কথাটি শুনে রাগে মাথার ভিতর কয়েকবার পাক দিয়ে ওঠে পন্ডিত সাহেবের। কিন্তু তিনি কথা দিয়েছেন রাগ করবেন না। তাছাড়া তিনি অন্য মানুষকে ধর্মান্ধ, কুসংস্কার আচ্ছন্ন ইত্যাদি কঠিন ভাষায় তিরষ্কার করেন অতএব, তার মধ্যে কি কি অন্ধত্ব আছে তা বলার অধিকার অন্যদের আছে। অনেক্ষণ নিরব থেকে নিজেকে বেশ খানিক ঠান্ডা করে নিয়ে তিনি বলেন,

- আপনি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন?

বেশ জোরে জোরে মাথা নেড়ে না সূচক উত্তর দিয়ে লোকটি বলে,

- একথা আমি বলি নি। এক মওলানা তার ওয়াজে বলেছে। আপনি চাইলে আমি আপনাকে ওয়াজটি শুনাতে পারি।

কথাটি বলে লোকটা পকেট থেকে নিজের স্মার্ট ফোনটি বের করে পন্ডিত সাহেবকে দেখায়। পন্ডিত সাহেব একটু নাখোশ হয়ে বলেন,

- তাহলে আপনারা এখন মৌলবাদীদের ওয়াজ-নাসিহত শোনেন?

এই অভিযোগের প্রতিউত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন করে লোকটি বলে,

- আমরা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। যে কারও বই পড়া বা বক্তব্য শোনার অধিকার আমাদের আছে। যে কারও বক্তব্য শোনা দোষের কিছু নয়। তবে যাদের কারণে মোল্লা মৌলবীরা আমাদের নিন্দা-মন্দ করার সুযোগ পাচ্ছে তারাই প্রকৃত দোষী।

পন্ডিত সাহেব বিব্রত বোধ করেন। লোকটা পরক্ষভাবে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করছে। সে সরাসরি কথাটা বলার পূর্বেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তিনি। হালকা ভাবে বলেন,

- তাহলে আমরা আমাদের নাম গুলো নিয়ে কি করতে পারি?

এই কথাটি শুনে লোকটি কিছুটা উৎসাহ বোধ করে। জোর দাবী জানিয়ে বলে,

- নাম পাল্টে ফেলতে হবে ....

লোকটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে পন্ডিত সাহেব বলেন,

- কিন্তু দুনিয়ার সব নাস্তিকের নাম পাল্টাতে হলে তো অনেক নতুন নামের দরকার। এতো নাম আপনি কোথায় পাবেন?

এই প্রশ্ন শুনে লোকটি আবার গর্ব অনুভব করে। তিনি অনেক পূর্বেই এর সমাধান বের করে ফেলেছেন। এখন পন্ডিত সাহেব প্রস্তাবনাটি গ্রহণ করলেই হয়। কণ্ঠস্বরে কিছুটা দৃঢ়তা প্রকাশ করে লোকটি বলে,

- প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুযায়ী নাম রাখে, মুসলমানরা রাখে আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, হিন্দুরা রাখে রাম, লক্ষণ ইত্যাদি। নাস্তিকরা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না। তারা কোনো স্রষ্টা মানে না। তারা কেবল প্রকৃতির কথা বলে। প্রকৃতি এটা করেছে, প্রকৃতি ওটা করেছে ইত্যাদি। সুতরাং তাদের নাম হবে প্রকৃতিক। বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার আর গাছ-গাছালির নামে নাস্তিকদের নাম রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ভাল হয় যদি কারো নামের সাথে মিলিয়ে কাছাকাছি কোনো প্রাকৃতিক নাম রাখা যায়। যেমন ধরুন, একজন ব্যক্তি নতুন নাস্তিক হলো তার নাম বিলাল এখন তার নাম হবে বিড়াল, এভাবে যার নাম আয়েশা তার নাম হবে আগাছা ইত্যাদি। আমার নাম ছিল আব্বাস এই সূত্র অনুযায়ী আমি নিজের নাম রেখেছি আমগাছ। বিশ্বাস না হয় কচ্ছপ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেই দেখেন।

বলে পন্ডিত সাহেবের পাশে বসে থাকা মুক্তাঙ্গনের স্থানীয় পরিচালকের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটি। পন্ডিত সাহেব দৃষ্টি দিতেই তিনি বলে ওঠেন,

- একেবারে ঠিক কথা। প্রায় বছর দশেক ধরে তার সাথে আমাদের পরিচয়। তিনি একজন গোঁড়া নাস্তিক। ধর্মের কিছুই তিনি পছন্দ করেন না। তার বাবা খুব ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি শখ করে রাসুলের চাচার নামে তার ছেলের নাম রাখেন আব্বাস। বেচারা সে নামটা পরিবর্তন করে নিজের নাম রেখেছে আমগাছ। আমার কেসমত নাম পাল্টে সে এখন আমাকে কচ্ছপ ডাকে। কয়েক বার আমি তাকে নিষেধ করেছি কিন্তু সে শোনে না। কেবল বলে কেসমত মানে ভাগ্য। নাস্তিক ভাগ্যে বিশ্বাস করে না অতএব এ নাম চলবে না। তিনি নিজেকে একজন খাঁটি নাস্তিক বলে দাবী করেন আর অন্যদের খাঁটি নাস্তিক বানানোর চেষ্টা করেন। এখানকার নাস্তিকদের মধ্যে বিশেষত যুবক নাস্তিকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। এখন আমরা তার মতামত মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। এখন দেখুন আপনি কি করবেন!

জনাব কচ্ছপের কথা শেষ হলে পন্ডিত মশায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেন,

- দেখুন মি. আমগাছ। আপনি আমার নাম কি রাখবেন?

এই কথাটি শুনে খুশিতে লোকটির সবগুলো দাঁত বের হয়ে আসে। জোর করে সেগুলো ঢাকার চেষ্টা করতে করতে বলে,

- আপনার নাম একটু জটিল। যদি রাগ না করেন ....

- না, না। রাগ করবো না আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

অনুমতি পেয়ে লোকটা আরও বেশি খুশি হয়। একটু সংকোচের ভাব করে বলে,

- আপনার নাম খোদা বখস থেকে গাধা বখস হবে।

পন্ডিত সাহেব বার কয়েক ঢোক গিলে বলেন,

- গাধা বখস!!

- জী হ্যাঁ আপনি এটাকে খারাপ মনে করবেন না। গাধাকে খারাপ মনে করাটাও কিন্তু এটা অন্ধ কুসংস্কার। মানুষ সিংহ বললে রাগ করে না কিন্তু গাধা বললে রাগ করে। অথচ সিংহ হিংস্র আর গাধা নিরীহ। অতএব, নিশ্চিত করে বলা যায় সিংহের চেয়ে গাধা নামটি ভাল।

- যুক্তিটি পন্ডিত সাহেবের পছন্দ হয় কিন্তু এ বিষয়ে তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে। আমতা আমতা করে তিনি বলেন,

- তা না হয় হলো। কিন্তু খোদা বখস মানে যদি আল্লাহর দান হয় তাহলে গাধা বখস মানে হয় গাধার দান। এটা কি সটিক অর্থ হলো, জনাব আমগাছ।

মাথা ঝাকিয়ে পন্ডিত সাহেবের কথায় সম্মতি জানিয়ে লোকটি বলে,

- জী স্যার। পুরোপুরি সঠিক। দেখুন, ডারউনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কোনো স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই অন্যান্য জন্তু জানোয়ার থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আপনি কি এই মতবাদ বিশ্বাস করেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- অবশ্যই। আমরা নাস্তিকরা সবাই এটা বিশ্বাস করি।

একটু মুচকি হেসে লোকটি বলে,

- যেহেতু গাধাও একটা জন্তু অতএব, বিবর্তনবাদ অনুসারে আপনার সৃষ্টিতে গাধারও একটা অবদান আছে। অতএব, গাধার দান কথাটা ঠিকই আছে এতে কোনো ভুল নেই।

এই যুক্তিটিও পন্ডিত সাহেবের বেশ পছন্দ হয়। তিনি নিজেও আসলে মানুষকে খাঁটি নাস্তিক বানাতে চান। এ পথে একজন বুদ্ধিমান সহযোগী পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি হোন। নিজের বুকে দু'বার থাবা দিয়ে বলেন,

- আমি আপনার সাথে আছি। আপনি এই সূত্র অনুযায়ী সকল নাস্তিকদের নাম পাল্টে দেবেন। এ ব্যাপারে আমি গাধা বখস আপনাকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করলাম।

কথাটি শুনে লোকটি খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। অতিথিকে বারবার ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়ে। উপস্থিত জনতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পন্ডিত সাহেব বলেন,

- আর কেউ কি কিছু বলবেন?

কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে জনাব হাসমত বসে বসেই নিজের হাতটি উপরে তোলেন। তার হাতটি পন্ডিত মশায়ের দৃষ্টিগোচর হয়। মুখটা যথা সম্ভব হাস্যজ্জল রেখে তিনি বলেন,

- জী বলুন।

হাসমত সাহেব নিজের আসনে বসে বসেই বললেন,

- যে ডারউইনের কারণে নিজেকে গাধা বানিয়ে ফেললেন তার মতবাদটা সঠিক কিনা তা ভেবে দেখেছেন?

সম্ভবত কানে খাটো হওয়ার কারণে অথবা দূর থেকে কথাটি বলা হয়েছে এ কারণে পন্ডিত সাহেব প্রফেসরের কথাটি শুনতে পেলেন না। তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে, লোকটি বসে কথা বলছে। তিনি বললেন,

- দয়া করে আপনি দাড়িয়ে কথা বলুন।

প্রফেসর সাহেবের অপমান বোধ এবার দ্বিগুন হলো। বেশ একটু রাগত স্বরে বললেন,

- আমি দাড়াতে পারবো না। আমার পায়ে ব্যাথা।

নতুন অতিথি যেনো কিছুটা বিব্রত হলো, বিব্রত হলো তার পাশে বসে থাকা মি. কচ্ছপও। অতিথি বিস্ময়ের ভাব করে বলেন,

- একটু আগেই তো দেখলাম আপনি তাল গাছের মতো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রফেসর সাহেব এবার আরও বেশি রেগে যান। পূর্বাপেক্ষা বেশি কর্কশ কণ্ঠে বলেন,

- তখন দাঁড়িয়ে থেকেই তো আমার পায়ে ব্যাথা হয়েছে। তাছাড়া একজন বয়স্ক লোক হিসেবে বসে কথা বলার অধিকার আমার আছে।

মুরব্বী লোকটিকে অধিক রেগে যেতে দেখে কিছুটা সংযত হয়ে যান পন্ডিত সাহেব। জোর করে মেজাজ ঠান্ডা করে বলেন,

- দাড়াতে না চাইলে দরকার নেই কিন্তু দয়া করে একটু সামনে এগিয়ে এসে বসুন।

একথা শুনে হাসমত সাহেব বেশ জোরে হেঁটে সামনে এগিয়ে আসেন। সবাই এক নজরে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সম্ভবত তারা ভাবছে যে লোকটা পায়ের ব্যাথার কারণে দাড়াতে পারেনা সে এত জোরে হাটছে কীভাবে! পন্ডিত সাহেব অবশ্য এটা নিয়ে ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন এই ব্যক্তির প্রশ্নের ধরন নিয়ে। ইতোমধ্যে একেবারে অতিথির সামনের একটা আসনে এসে বসে পড়েন প্রফেসর সাহেব। আর তখনই পন্ডিত মশায়ের গলা শোনা যায়,

- কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, সময় সংক্ষিপ্ত।

কথাটি শুনে হাসমত সাহেবের রাগে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তবে অধিক রাগারাগি সংগত নয় ভেবে নিজেকে কিছুটা সংযত করে বলেন,

- কয়েকদিন আগে পনের/ষোল বছরের একটা ছেলে আমার কাছে এসেছিল। সে খুব চমৎকারভাবে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ভুল প্রমাণ করে। ......

প্রফেসর সাহেব কথা শেষ করতে পারেন না। পনের/ষোল বছরের একটা ছেলে ডারউইনের মতবাদ ভুল প্রমাণ করেছে শুনে রাগে ফুসে ওঠেন পন্ডিত সাহেব। প্রফেসর সাহেবকে বাধা দিয়ে বলেন,

- আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

হাসমত সাহেব নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। তিনিও গর্জে ওঠেন,

- মি. পন্ডিত, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি।

এতে কিছুমাত্র রাগ কমে না পন্ডিত সাহেবের। তবে তিনি নিরব থাকেন। সেই ফাঁকে প্রফেসর সাহেব শহিদের যুক্তি প্রমাণগুলো যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পেশ করেন তার সামনে। তার পেশ করা উদাহরণগুলোও বর্ণনা করেন। যখন মনে হলো মোটামুটি গুছিয়ে সব বলতে পেরেছেন তখন বললেন,

- এসব যুক্তিকে আপনি কিভাবে খন্ডায়ন করবেন সেটা জানতে চাই।

পন্ডিত সাহেব এবার রাগে ফেটে পড়লেন। যতদূর সম্ভব গলা উঁচিয়ে বললেন,

- এসব গাঁজাখুরি কথার আমি কি খন্ডায়ন করবো? আপনার বয়সের ভারে বুদ্ধি ভোতা হয়ে গেছে তাই এসব কথাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ...

পন্ডিত মশায় আরও কিছু বলতেন কিন্তু প্রফেসর সাহেব এরই মধ্যে উঠে দাড়িয়ে টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বলেন,

- আপনি আমাকে চিনতে ভুল করছেন। আমি প্রফেসর হাসমত। কথার গুরুত্ব মাপার মাপকাঠি সম্পর্কে আপনার চেয়ে অনেক বেশি জানি।

পাশে বসে থাকা পাঠাগারের পরিচালক পন্ডিত সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন,

- উনি প্রবীণ লোক। বলতে পারেন আমাদের নেতা।

পন্ডিত সাহেবের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। মনে হলো প্রফেসর সাহেবের নাম শুনে তিনি কচুর মতো গলে গেছেন। পকেট থেকে একটা ডায়রী বের করে পাতা উল্টিয়ে কি যেনো পড়লেন তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে ডান হাতটা কপাল পর্যন্ত উঁচু করলেন। আর সাথে সাথেই ডান পাটা উচু করে মাটির উপর প্রকাণ্ড শব্দে আঘাত করলেন। সেই শব্দে উপস্থিত সবাই চমকে উঠলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সম্ভিত হারিয়ে ফেলল অনেকে। এত বড় পন্ডিত যাকে কিনা বলা হয় মহা পন্ডিত তিনি হাসমত সাহেবকে স্যালুট করছেন দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। অবাক হলেন হাসমত সাহেব নিজেও। তিনি নিজের নাম বলেছেন স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকু আদায় করার জন্য কিন্তু এর মাধ্যমে এত বড় সম্মান পাওয়া যাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। পন্ডিত সাহেব হাত নামিয়ে দু এক পা সামনে এগিয়ে আসেন। প্রফেসর সাহেবের দিকে নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে দেন। প্রফেসর সাহেবও তার দিকে হস্ত প্রসারিত করেন। প্রফেসর সাহেবের হাতে হাত রেখেই পন্ডিত সাহেব বলেন,

- আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি চিনতে পারি নি। এখনে আসার পূর্বে আমাকে এখানকার প্রবীন নাস্তিকদের একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল আপনাদের সম্মান করতে। আমি মারাত্মক ভুল করেছি। যদি আপনি আমার নামে নালিশ করেন তাহলে আমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রফেসর সাহেব এবার নেতৃত্বের আসন পেয়ে গেলেন। মৃদুভাবে মাথাটা উপর থেকে নিচে ঝাকাতে ঝাকাতে বলেন,

- কেন্দ্রের লোকরা তাহলে এখনও সিনয়রিটি বজায় রাখে! আমি তো ভেবেছিলাম ছোঁকড়া নাস্তিকরা প্রবীণদের সম্মানের আগা-মাথা খেয়ে বসে আছে। তা লিস্টে আর কার কার নাম আছে শুনি।

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে পন্ডিত সাহেব আবার ডায়রীটি বের করে নামগুলো পড়তে শুরু করেন,

- এখানে তিন জনের নাম লেখা হয়েছে,

একঃ প্রফেসর হাসমত ওরফে হাসু,

দুইঃ কদম আলী মাস্টার ওরফে কদু

তিনঃ আব্বুল জব্বার ওরফে জুবা মেম্বার

তিন নম্বর নামটি শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। হাসেন হাসমত সাহেবও। এ হাসির কোনো অর্থ খুঁজে পায় না পন্ডিত সাহেব। তিনি কেবল ভাবছিলেন কদু নামটি যদি হাস্যকর না হয় তবে জুবা নামটি শুনে হাসির কি আছে? কিছুক্ষণ ভেবে যখন অর্থ বের করতে পারলেন না বিনীতভাবে বললেন,

- আপনারা কি বুঝে হাসছেন জানতে পারি?

পাশ থেকে একজন বলল,

- বুঝলাম, কর্তা বাবুরা আমাদের খোঁজ-খবর কমই রাখেন। জুবা মেম্বার যে ছ' মাস আগে ইহধাম ত্যাগ করেছে সে খোঁজও তারা রাখে নি। তাহলে সারাটা জীবন বেচারার নাস্তিকতা করে কী আর লাভ হলো!

ঘটনা শুনে পন্ডিত সাহেব আসলেই দুঃখিত হোন। কিছু একটা যুক্তি দিয়ে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন।

- দেখুন আমাকে বলা হয়েছে এই তিনজনকে সম্মান করতে। তারা জীবিত কি মৃত তা তো আর বলা হয় নি। মৃত্যুর পর কি কারও সম্মান করা যায় না?

এ যুক্তিতে কেউ সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না। হাসমত সাহেবের ডান পাশ থেকে একজন বলল,

- মরনের পরে জুবা মেম্বার কি সম্মান পেয়েছ তা স্যারকে একটু শুনিয়ে দাও।

তার কথা শেষ হতে না হতেই আরেকজন বলে ওঠে,

- আহা বেচারা! মরার পরে একটু শান্তিতে ঘুমোবে সে উপায় নেই। তার লাশ নিয়ে শুরু হলো টানা-টানি ..

পাশ থেকে একজন সংশোধন করে বলে,

- টানা-টানি নয়, ঠেলা-ঠেলি।

আগের জন নিজের কথা সংশোধন করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করে,

- হুজুররা বলল, নাস্তিকের জানাযা হবে না, কবরস্থানে কবর হবে না। ঠিক করা হলো স্কুল মাঠের এক কোনে একটা গর্ত করে তাকে পুতে ফেলা হবে। মানুষ তাতেও বাঁধ সাধলো। স্কুলের ছাত্র, গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই আন্দোলন শুরু করলো। বাপরে! সে কি লম্বা মিছিল, আর জ্বালাময়ী স্লোগান!

নাস্তিকের চামড়া

তুলে নেবো আমরা

****

নাস্তিকের মরা লাশ

কবর দিলে সর্বনাশ

এতদূর শুনেই মনটা বিষিয়ে উঠলো পন্ডিত সাহেবের। ডান হাতের উল্টো পীঠ দিয়ে বাতাসে একটা ধাক্কা মেরে বলেন,

- শেষে কি ব্যবস্থা হলো?

লোকটি ভীষণভাবে ঠোট বাঁকিয়ে বলে,

- কী আবার? আমরা নেতা-নেত্রীদের হাত-পা ধরে অনেক চেষ্টা চরিত্র করলাম। বললাম, বেচারার নাম তো আব্দুল জব্বার, কমপক্ষে নামটার দিকে তাকিয়ে তাকে মুসলমান হিসেবে ধরে নিয়ে একটা কবরের ব্যবস্থা করুন। তারপর মুসলমানেদর কবরস্থানের পাশে একটা পরিত্যক্ত জমিতে গর্ত করে লাশটি বিনা গোসলে, বিনা কাফনে পুতে ফেলা হলো। আজ পর্যন্ত হুজুররা দোয়া করার সময় তার কবরটিকে পেছনে রেখে দাড়ায়।

পন্ডিত সাহেব কিছুক্ষণ আহ! উহ! এই জাতীয় শব্দ করেন। তারপর বলেন,

- কেন্দ্রের লোকদের অবশ্যই এসব ব্যাপারে খোঁজ খবর করা উচিৎ।

পাশ থেকে একজন বলে,

- সেই সাথে নাস্তিকদের সৎকারের ব্যাবস্থা কি হবে সেটিও ঠিক করে দেওয়া উচিৎ। কি বলেন স্যার?

পন্ডিত সাহেব জানেন, সমাজে মৃত ব্যক্তির সৎকারের নতুন পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারটি সহজ নয়। তিনি বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করেন। তাচ্ছিল্লের স্বরে বলেন,

- ব্যবস্থা আবার কী, মুসলমানরা কবর দিতে না চাইলে হিন্দুদের কাছে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যায়। তাই না?

কথাটি শেষ হতেই কয়েকজন এক সাথে বলে উঠলো,

- ওরে বাবা! তবেই সেরেছে!

শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে পন্ডিত সাহেব বলেন,

- কেনো, সমস্যা কি?

তাদের মধ্যে একজন বলে,

- রামের অনুচরদের আবার জাত-পাত জ্ঞান একটু বেশি। ওদের কাছে লাশ পুড়াতে গেলে লাশ রেখে আমাদেরই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

বাকীরা কথাটা সমর্থন করে। আরেকজন যোগ করে,

- ওদের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে আবার কঠিন মামলা। সংখ্যা লঘু নির্যাতন।

পিছন থেকে একজন বলে,

- আচ্ছা হিন্দুদের সংখ্যা লঘু বলা হয় কিন্তু আমাদের কেনো বলা হয় না?

কেউ একজন বলে,

- ওদের সংখ্যা কম তাই বলা হয় লো-ঘু আর আমাদের সংখ্যা নেই বললেই চলে তাই বলা হবে নো-ঘু। লো-ভোল্টেজ আর নো-ভোল্টেজের মধ্যে পার্থক্য আছে না?

এ কথাটির মাধ্যমে এতক্ষণের আলোচনা হাস্যরসে পরিনত হয়। দু'একজনকে হাসতেও শোনা যায়।

শোক বার্তা কৌতুকে পরিনত হয়েছে দেখে পন্ডিত সাহেব মর্মাহত হোন। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলার চেষ্টা করেন,

- তা প্রফেসর সাহেব যেনো কি বলছিলেন? আমরা এখন আপনার কথা শুনতে পারি।

পুনরায় সুযোগ পেয়ে প্রফেসর সাহেব কালবিলম্ব না করে পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়েন। পন্ডিত সাহেবও বসে পড়েন তার পাশের একটা চেয়ারে। এখন মনে হচ্ছে তারা একে অপরের বন্ধু। প্রফেসর সাহেব নিজের কথাগুলো আগা-গোড়া আবার শোনাতে শুরু করেন। কথার মাঝে একবার থেমে তিনি তাকালেন পন্ডিত সাহেবের দিকে। তিনি লক্ষ্য করলেন লোকটি গাধার মতো না বুঝেই কেবল মাথা ঝাকিয়ে

যাচ্ছে। এর অর্থ হলো, তিনি প্রফেসর সাহেবকে তোষামোদ করছেন। এধরনের তোমাষামোদ একেবারে পছন্দ নয় প্রফেসর সাহেবের। তিনি বললেন,

- কেবল মাথা না ঝাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন।

- জী হ্যাঁ আমি সব বুঝতে পারছি।

নিতান্ত বিনীতভাবে কথাটি বলে আবার মাথা ঝাকাতে শুরু করে লোকটি।

নিজের বক্তব্য পুরোপুরি শেষ করে প্রফেসর সাহেব বলেন,

- এখন বলুন এই ছেলাটাকে আমি কিভাবে তর্কে হারাতে পারি?

প্রফেসর সাহেবের এবারের কথাগুলো পন্ডিত সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তার মনে হচ্ছে এখানে বেশ কয়েকটি স্থানে বড় বড় ফাঁক-ফোকোর রয়েছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ছেলেটাকে খুব সহজে ধরাসায়ী করা যাবে। প্রফেসর সাহেবকে সেসব বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে তর্কে বিজীয় হওয়ার সুযোগ দিলে সু-নামটা তারই হবে। এমন বোকামী পন্ডিত সাহেব করতে পারেন না। তিনি নিজেই ছেলেটার সাথে তর্ক করবেন। বেশ কয়েক জায়গায় তর্ক-বিতর্ক করে নাস্তিক মহলে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন তিনি। অতএব, এই বাচ্চা ছেলেটাকে ধরাসায়ী করে নিজের সুনামের পাল্লাটা ভারি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই আশা নিয়েই তিনি বললেন,

- আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমি আগামী কাল পর্যন্ত এ এলাকায় আছি। কাল ছেলেটাকে হাজির করেন। আমি নিজে তার সাথে কথা বলবো।

পন্ডিত সাহেবের এই দুঃসাহস দেখে হাসমত সাহেব নিজে যেমন অবাক হোন উপস্থিত অন্যান্যরাও অবাক হয়। এ সিদ্ধান্তে সবাই বেশ আনন্দিত হয়। অতি উৎসাহী কেউ কেউ চিৎকার করে বলে,

- গাধা বখস, জিন্দাবাদ!

প্রতিউত্তরে পন্ডিত সাহেব মুচকি হেসে তাদের স্বাগত জানান। এখন আর নিজেকে গাধা হিসেবে কল্পণা করতে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কে জানে হয়তো কিছুদিন পর পশুদের মতো মা-মেয়ে যে কারো সাথে বিয়ে করার ব্যাপারটিকেও মেনে নিতে পারবেন। তবে এটা উন্নতি না অবনতি সেটা এখনও তার নিকট স্পষ্ট নয়।

চার.

বাড়ি ফিরে হাসমত সাহেব আগমী কালের বিতর্কের জন্য আয়োজন শুরু করেন।

পরবর্তী সময়টা তার বেশ দুঃচিন্তার মধ্যে কাটলো। তার এখন দুটি চিন্তা, শহিদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন আর যোগাযোগ করলেও সে আসতে রাজি হবে কিনা। শহিদের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো কদম আলীর সাথে কথা বলা। কিন্তু বেচারা কদম আলী বেজায় কৃপণ, বিল দেওয়ার ভয়ে একটা টেলিফোন পর্যন্ত বাসায় রাখে নি। তাহলে এখন উপায়! ল্যাবরেটরীতে কিছুক্ষণ মনমরা হয়ে বসে থেকে প্রফেসর সাহেব হঠাৎ গাঁ ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েন। বইয়ের তাকে তল্লাশী করে ছোট একটা ডায়রী বের করে দ্রুত পাতা উল্টাতে থাকেন। তিনি পরিচিতজনদের ফোন নম্বর এখানে লিখে রাখেন। তার মনে হচ্ছে, বেশ কয়েক দিন আগে কদম আলী তার এক প্রতিবেশীর ফোন নম্বর দিয়েছিল। যন্ত্রচালিতের মতো বেশ কিছুক্ষণ জোরে জোরে হাত চালিয়ে একস্থানে এসে থেমে গেলেন তিনি। তিনটি লাইন তার দৃষ্টিগোচর হয়। গোটা গোটা ভাবে একটি ফোন নম্বর লেখা রয়েছে। ঠিক তার নিচে লেখা রয়েছে, কদম আলী তার পর আরও একটি নাম; বিশারত। অর্থাৎ ফোন নম্বরটির মালিক জনাব বিশারত যিনি কদম আলীর প্রতিবেশী। আর এক মুহুর্ত দেরি না করে প্রফেসর সাহেব পাশেই রাখা টেলিফোনটিতে ফোন নম্বরটি প্রবেশ করিয়ে ডায়াল করেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে টু-টা শব্দ শোনা যায় কিন্তু ফোনটি রিসিভ হয় না। তিনি পুনরায় ডায়াল করেন। এবার খুট করে কেউ একজন ফোনটি রিসিভ করেই বলে,

- কে বলছেন?

প্রফেসর সাহেব কি বলবেন ভেবে পান না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলেন,

- আজ্ঞে আপনি কি জনাব বিশারত?

- জী হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?

- দেখুন আমাকে আপনি চিনবেন না।

কথাটি শুনে ওপাশের লোকটি দারুণ বিরক্ত হলো। মনে মনে ভাবল, যাকে চিনা যাবে না রাত বিরেতে তার ফোন দেওয়ার কি দরকার!। সে বিস্ময় ঢেকে রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

- তা আমার কাছে আপনার কি কাজ বলুন তো!

- আপনি কি কদম আলীকে চেনেন?

নামটা শুনে বিশারত সাহেবের মুখটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। তিনি কদম আলীকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। মাঝে মাঝেই লোকটা তাকে বিরক্ত করে। কারণে অকারণে এসে তার

সাথে গল্প-গুজব করতে চায় আর সুযোগ পেলেই তার টেলিফোনে এর ওর সাথে কথা বলে। তার ফোন নম্বরটি রাজ্যের সব লোকের কাছে দিয়ে রেখেছে। কারও কিছু হলেই তার নম্বরে যোগাযোগ করে বলে, কদম আলীকে একটু ডেকে দেন তো। ভীষণ বিরক্তিকর দায়িত্ব। এতক্ষণে বিশারত সাহেব বুঝতে পারেন এবারের ঘটনাটিও তারই পুনরাবৃত্তি। তিনি রাগত স্বরে বলেন,

- জী চিনি, তাতে কি হয়েছে?

লোকটির কণ্ঠস্বর প্রফেসর সাহেবের নিকট খুব একটা ভাল লাগেনা। তবু তিনি অনেকটা বিনীতভাবে বলেন,

- যদি ওনাকে একটু ডেকে দিতেন ভাল হতো। ওনার সাথে আমার খুব জরুরী কিছু কথা আছে।

প্রফেসর সাহেব আশা করছিলেন এই মুহুর্তে লোকটি তাকে গালিগালাজ করে ফোনটি রেখে দেবে। ফলে কদম আলীর সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র পথটিও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বোঝা গেলো তার ভাগ্যটা অত খারাপ নয়। লোকটি ফোন রেখে দিলো না তবে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে লোকটি বলে,

- আপনি দুটো অন্যায় করেছেন, প্রথমত আমাকে ভোর রাতে ঘুম থেকে তুলেছেন, দ্বিতীয়ত রাত দুপুরে চোরের মতো অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে তাকে ডেকে আনতে বলছেন।

প্রফেসর সাহেব কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। রাত কিভাবে দুপুর হয় সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন তারপর অনুনয় করে বলেন,

- দেখুন বিশারত সাহেব, আমি আপনার পায়ে পড়ছি আপনি দয়া করে কদম আলীকে একটু ডেকে দেন।

পায়ে পড়ার কথা শুনে বিশারত আলী চমকে উঠে নিজের পায়ের দিকে তাকায়। তার ডান পাটি ভীষণভাবে ফুলে রয়েছে। গত কয়েক দিন আগে সেখানে একটা ফোঁড়া হয়েছে। দিনে দিনে বড় হয়ে সেটা এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গত পরশু তার ছোট মেয়েটা ধপাস করে পায়ের উপর পড়ল। প্রচন্ড ব্যাথায় বেচারার প্রাণটা যেনো বের হয়ে যায় এমন অবস্থা। এখন এই বয়স্ক মানুষটা পায়ে পড়লে কি অবস্থা হবে সেটা ভাবতেই বিশারত আলীর গলা শুকিয়ে আসে। তাড়াহুড়া করে বলে,

- না না, দয়া করে আমার পায়ে পড়বেন না। আমি খুব ব্যাথা পাবো। আমি বরং এখুনি কদু মিঞাকে ডেকে দিচ্ছি।

লোকটির ব্যবহারে এমন পরিবর্তন দেখে হাসমত সাহেব ভীষণ খুশি হোন। মানুষের মধ্যে যে এখনও কিছু মানবতা আছে তা লক্ষ্য করে তিনি পুলকিত হোন। কেউ পায়ে পড়বে এটা শুনে মানুষ যে এখনও অন্তরে ব্যাথা অনুভব করে সেটা নিশ্চয় ভাল জিনিস। এরই মধ্যে তার ফোনটি বেজে ওঠে। রিসিভ করতেই পরিচিত কণ্ঠ শোনা যায়,

- হেলো, হাসু? আমাকে খুঁজছিস?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা তুই কেমন আছিস?

- আছি ভাল কিন্তু তোর খবর কি বল। এত রাতে ফোন করেছিস, কোনো বিপদ-আপদ নয় তো?

- আরে না, তেমন কিছু নয় তবে একপ্রকার বিপদই বটে।

- বিপদ না, আবার বিপদ এইটা কোনো কথা হলো? সাহিত্য ছেড়ে সত্য কথা বল।

এরপর হাসমত সাহেব পুরো ঘটনাটি খুলে বলতে শুরু করেন আর কদম আলী মাঝে মাঝেই হু হু জাতীয় শব্দ করছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনে বললেন,

- তাই নাকি? তাহলে তো বেশ খুশির সংবাদ। ঠিক আছে আমি কাল সকালে ছেলেটাকে সাথে নিয়ে মুক্তাঙ্গনে হাজির হয়ে যাবো। এখন রাখি।

বলেই খটাস করে ফোনটি রেখে দেন কদম আলী। বিশারত নামের লোকটি চোখ গোল্লা গোল্লা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিপদের কথা কিভাবে খুশির সংবাদ হতে পারে সে এখন তাই ভাবছে।

কথা মতো পরদিন যথা সময়ে কদম আলী শহিদকে নিয়ে মুক্তাঙ্গনে হাজির হয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকেই শহিদ চারপাশের পরিবেশটা এক নজর দেখে নেয়। বড় বড় বইয়ের তাকগুলো দিয়ে শুরু করে তারপর মাথা নামিয়ে অগাছালোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর দিকে লক্ষ্য করে। বেশিরভাগই খালি পড়ে আছে। ঘরে মাত্র দু'দশ জন লোক বসে আছে। তারা সবাই শহিদের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। আজ যে মহা পন্ডিতের সাথে এক বাচ্চা ছেলের তর্ক-বিতর্কের অনুষ্ঠান আছে তা সবাই জানে। এই ছেলেটিই যে, পন্ডিত সাহেবের প্রতিপক্ষ সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কারণেই তারা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। পুরো ঘরটি পর্যবেক্ষণ শেষে লোক সমাগম থেকে দূরে একটি চেয়ারে চুপটি করে বসে পড়ে শহিদ। এই শান্ত ছেলেটি বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষকে কতটা অশান্ত করে তুলতে পারে তা এখন বোঝার উপায় নেই। ইতোমধ্যে তড়ি-ঘড়ি করে প্রবেশ করেন হাসমত সাহেব। এদিক সেদিক

তাকিয়ে কদম আলী আর শহিদকে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। এগিয়ে গিয়ে দু'জনের সাথে সাক্ষাত করে একটা চেয়ারে নিরবে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গী সহ পন্ডিত সাহেব হাজির হয়ে যান। তাকে দেখে উঠে দাড়ায় সবাই। কেবল শহিদ আর প্রফেসর সাহেব যথাস্থানে বসে থাকে। কদম আলী প্রথমে উঠে দাড়িয়েছিলেন, পরে যখন দেখলেন তার বন্ধু স্থির বসে রয়েছে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ডানে বায়ে তাকিয়ে বসে পড়লেন। পন্ডিত সাহেবের ইশারা অনুযায়ী একটু পর অন্যরাও বসে পড়লো। পাশে রাখা একটি গদি চেয়ারে পন্ডিত সাহেবও বেশ আরাম করে বসলেন। তাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। গত রাতে তিনি খুব কমই ঘুমিয়েছেন। হাসমত সাহেবের কথাগুলো নিয়ে ভাল করে ভেবে দেখেছেন। ছেলেটা যেসব যুক্তি দিয়েছে সেগুলো অখণ্ডনীয়। ওগুলো নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে তিনি ফেঁসে যাবেন। তবে বিতর্কের আরেকটি পন্থা ভেবে রেখেছেন তিনি। কেবল প্রতিপক্ষের আক্রমণের জাবাব দিয়েই তিনি ক্ষ্যান্ত থাকবেন না বরং তিনি নিজেও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবেন। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। যদি কিছুতে পার না পাওয়া যায় তবে খুব জটিল একটা প্রশ্ন করবেন। তার বিশ্বাস এই প্রশ্নটির উত্তর কেউ দিতে পারবে না। এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করেই তিনি বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তার অন্তরে নিশ্চয়তা ঠোটের কোনায় এক চিলতে হাসির মাধ্যমে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল। চারিদিকে নিরাবতা বিরাজ করছিল। হাসমত সাহেব অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই নিরাবতা ভেঙে বললেন,

- মনে হচ্ছে সবাই হাজির। আমি মনে করি এখনই মূল অনুষ্ঠান শুরু করা যায় তবে তার আগে আমি পন্ডিত সাহেবকে আমার বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এই হচ্ছে কদম আলী ওরফে কদু। এ এলাকার একজন প্রবীন নাস্তিক।

কথাটি বলে নিজে বসে থেকেই ইশারায় কদম আলীকে উঠে দাড়াতে বলেন প্রফেসর সাহেব। কদম আলী উঠে দাড়াতেই পন্ডিত সাহেব যেনো ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ঠাঁই বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ দাড়িয়ে স্যালুট করলেন। তার পায়ের শব্দে ঘরটা প্রকম্পিত হলো। ঘটনা দেখে কদম আলী নিজেও ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন। এখন তার কি করা উচিৎ তা বুঝতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পর পন্ডিত সাহেব তার আসনে বসে পড়েন। হাসমত সাহেবের ইশারা অনুযায়ী বসে পড়েন কদম আলীও। সাথে সাথেই হাসমত সাহেব বলেন,

- এখন বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু করা যায়।

তার কথা সকলে সমর্থন করে। মুক্তাঙ্গনের স্থানীয় পরিচালক উঠে দাড়িয়ে বলে,

- বিতর্ক যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য একজন উপস্থাপক আর দু'জন বিচারক প্রয়োজন।

তার কথা শেষ হতেই পন্ডিত সাহেব খুক খুক করে কেশে নিয়ে বলেন,

- আপনিই উপস্থাপক হিসেবে থাকুন। আর বিচারক হিসেবে আমাদের দুইজন মুরব্বীকে নিয়োগ দেওয়া হোক।

এ প্রস্তাবটিও সবার পছন্দ হয়। সেই মোতাবেক মঞ্চ সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। একটি চারকোনো লম্বা টেবিল ঘরের পশ্চিম কোনে উত্তর দক্ষিণে লম্বা-লম্বিভাবে বসানো ছিল। টেবিলটির উত্তর আর দক্ষিণ পাশে পন্ডিত সাহেব আর শহিদ মুখো-মুখি অবস্থান নেয়। আড়াআড়ি পশ্চিম দিকে উপস্থাপক এবং দুজন বিচারক বসে পড়েন। তাদের সামনে দশ বারো জন শ্রোতা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রস্তুতি শেষ হলে উপস্থাপক সাহেব কথা শুরু করেন,

- প্রথমেই আমি দুই পক্ষকে নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করতে অনুরোধ করছি।

কথাটি বলেই তিনি পন্ডিত সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করেন। গোলরক্ষক যেভাবে বলটা ফেরত দেয় সেভাবেই তার ইঙ্গিতকে পন্ডিত সাহেব শহিদের দিকে ফিরিয়ে দেন। শহিদ মোলায়েম কণ্ঠে বলে,

- আমি শহিদ, ছাত্র।

শহিদের কথা শেষ হলে, পন্ডিত সাহেব নিজের হাতটি উঁচু করে বলেন,

- আমি গাধা বখস, পন্ডিত।

নাম শুনে শহিদ ভীষণ অবাক হয়ে প্রতিপক্ষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। গাধা কিভাবে পন্ডিত হয় সেটা সে এখনও বুঝে উঠতে পারে না। কথায় বলে গল্পে গরু গাছে ওঠে কিন্তু গল্পেও তো গাধাকে পন্ডিত বলা হয় না বরং বলা হয় শেয়াল পন্ডিত। এসব উদ্ভট চিন্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে শহিদ মূল প্রসঙ্গে আলোচনা কখন শুরু হয় সে অপেক্ষায় থাকে। সে সময় মুক্তাঙ্গনের মুল প্রবেশ দ্বারে একজন ব্যক্তির উপস্থিত লক্ষ্য করা গেলো। সালাম দিয়ে তিনি বললেন,

- আমি একানকার ইমাম সাহেব। লোক মুখে শুনলাম এখানে একটা বিতর্ক অনুষ্ঠান আছে তাই আমরা কয়েকজন শুনতে এসেছি। আমরা কি আসতে পারি?

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কিছুটা সময় লাগলো। কচ্ছপ সাহেব মুক্তাঙ্গনের স্থানীয় পরিচলাক। স্থানীয় ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত তারই নেওয়ার কথা। কিন্তু পন্ডিত সাহেবের উপস্থিতিতে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। পন্ডিত সাহেবও মুখে

কুলুক এঁটে রয়েছেন। শেষে হাসমত সাহেব দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নেন। ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলেন,

- জী হ্যাঁ আসুন তবে দয়া করে কোনো কথা বলবেন না তাহলে আলোচনা বিঘ্নিত হবে।

ইমাম সাহেব তার কথায় সম্মতি দিয়ে হাতের ইশারায় সবাইকে ভিতরে আসতে বলেন। নিজেও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়েন। শহিদ নবাগত লোকগুলোর দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকে। দু'দশ জন নয়, প্রায় জনা ত্রিশেক লোক। কয়েকজন যুবক, কেউ কেউ আবার তার বয়সের। কিছু বৃদ্ধও আছে। কয়েকজনের বেশ-ভূষা ইমাম সাহেবের মতোই। পন্ডিত সাহেবও তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লম্বা একটা ঢোক গেলেন। বোঝায় যাচ্ছে, আজ তর্কে হেরে গেলে বেশ বড় রকমের মানহানী হবে। তবে তিনি এখনও হেরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখছেন না। পাঠাগারের চেয়ারগুলোতে সবার স্থান সংকুলান হলো না। কউ কেউ পিছনের দিকে দাড়িয়ে থাকলো। সবাই স্থান গ্রহণ শেষে বুকে সাহস সঞ্চয় করে পন্ডিত সাহেব কথা শুরু করেন। শহিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন,

- তুমি কি ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছো?

শহিদ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে,

- জী হ্যাঁ।

অনেকটা তাচ্ছিল্যের সাথে পন্ডিত সাহেব বলেন,

- তুমি কি নিজেকে ডারউইনের সমান মনে করো?

শহিদ বেশ জোরে মাথা নেড়ে বলে,

- না, না। কখনও আমি ডারউইনকে আমার সমান মনে করি না। কারণ সে কাফির আর আমি মুসলিম।

পন্ডিত সাহেব এ যাত্রা খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। ঠোট দুটো চিকন করে বললেন,

- তুমি ডারউইনের বিবর্তনবাদকে কিভাবে খন্ডায়ন করবে?

শহিদ তার পূর্বের কথাগুলো সুন্দরভাবে আবার উপস্থাপণ করে। চশমা ও পাথরের উদাহরণটা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেয় কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। পন্ডিত সাহেব জনতার দিকে

দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, উপস্থিত সবাই শহিদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। বোঝা যাচ্ছে তারা যুক্তিগুলো বুঝতে পেরেছে। হুজুররা তো বটেই এমন নি দু'একজন নাস্তিকও মাথা ঝাকিয়ে তার কথাকে সমর্থন করছে। বোঝাই যাচ্ছে এসব যুক্তি-প্রমাণ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা বোকামী হবে। এটা করলে মানুষ বুঝে নেবে যুক্তিকে খন্ডায়ন করার ক্ষমতা পন্ডিত সাহেবের নেই। ফলে তিনি বিতর্কে পরাজিত হবেন। এর চেয়ে বরং ভিন্ন দিক থেকে পান্ডিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করাই অধিক কল্যাণকর ভেবে পন্ডিত সাহেব যথা সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলেন।

- দেখো বাছা, তুমি যে বিষয়ে আলোচনা করছো সেটা ডারউইনের মতবাদের মুল অংশ নয়। বিবর্তনবাদের মুল অংশটা হলো, একটা প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা। ডারউইনের মতে একটি মাত্র প্রাণ থেকে কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকে আমরা যেসব জন্তু জানোয়ার দেখছি সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে। মানুষও আসলে সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য জীব জন্তু হতে পরিবর্তিত হয়ে। কিন্তু ইসলাম বলে, আল্লাহ আদম ও হাওয়া নামক দু'জন মানুষেকে সৃষ্টি করেন সকল মানুষ তাদেরই বংশধর। তুমি কি বিবর্তনের এই অংশটি খন্ডায়ন করতে পারবে?

পন্ডিত সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শহিদ নিজের মাথাটা উপর থেকে নিচে কিছুক্ষণ ঝাকিয়ে নিয়ে বলে,

- সব কিছুর একটা কারণ থাকে। বলুন তো সকল প্রাণী একটি মাত্র প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে ডারউইন কি কারণে এমন মনে করেছেন?

পন্ডিত সাহেব কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। হয়তো তিনি উত্তরটি মনে করার চেষ্টা করছেন। শহিদ তার মুখের দিয়ে চেয়ে অপেক্ষা করছে। সে চায় তিনি যেন সঠিক উত্তরটি দিতে পারেন। পরবর্তী আলোচনা বোঝার জন্য এই প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা একান্ত জরুরী। হঠাৎ পন্ডিত সাহেব নড়ে ওঠেন। তিনি উত্তরটি মনে করতে পেরেছেন। পান্ডিত্ব প্রকাশের ভাব দেখিয়ে বলেন,

- ডারউইন লক্ষ্য করলেন দুনিয়ায় যেসব প্রাণী আছে সেগুলোর একটার সাথে আরেকটার অনেক মিল আছে। যেমন ধরো, বানর বা গরিলার সাথে মানুষের বেশ খানিকটা মিল আছে। এটা দেখে তার মনে হলো এগুলো একই প্রাণীর বংশধর। একটা সহজ উদাহরণ দিই। ধরো, তোমার ক্লাসে দুটি ছেলে বা মেয়ে আছে যারা দেখতে প্রায় একই রকম। স্বাভাবিকভাবেই তুমি এটা চিন্তা করবে যে, তারা একই পিতা-মাতার বংশধর। তাই নয় কি?

পন্ডিত সাহেবের কথাগুলো আশানুরূপ হয়েছে দেখে শহিদ বলে,

- ডারউইন এখানে একটা মারাত্মক ভুল করেছেন। আপনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি সঠিক কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে একটা বড় ধরণের গোজামিল রয়েছে। আমি আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে আপনাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিই। ধরুন, আপনি মেলায় গিয়ে দেখলেন ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির বেশ কিছু পুতুল বিক্রি হচ্ছে। পুতুলগুলো দেখতে মোটামুটি একই রকম। সেগুলো বানানোর পদ্ধতিও এক। এখন আপনি কি বলবেন এ পুতুলগুলো একটি পুতুল থেকে জন্ম নিয়েছে না কি বলবেন একই ব্যক্তি এগুলো বানিয়েছেন?

পন্ডিত সাহেব স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- আমি বলবো একজন কারিগর সবগুলো পুতুল বানিয়েছেন। পুতুল কি আর পুতুলকে জন্ম দেয়?

শহিদ হেসে বলে,

- পুতুল পুতুলকে জন্ম দেয় না এটা আপনি কিভাবে জানেন?

পন্ডিত সাহেব খুব সহজভাবে বলেন,

- বাবার জনমে এমন অবাস্তব ঘটনা কখনও দেখিনি শুনিও নি।

শহিদ আবারও একটু হেসে নিয়ে বলে,

- এটা যেহেতু স্বীকার করছেন। এখন চিন্তা করুন তো একই মায়ের পেটে কি মানুষ আর বানর এক সাথে জন্ম নেয়? এমন কি কখনও দেখেছেন বা শুনেছেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা নাড়েন। তিনি দেখেন নি। শোনেনও নি। তবে কল্পণা করেছেন। নাস্তিক হওয়ার পর থেকে এই উদ্ভট দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই কল্পিত বিজ্ঞানই তাকে পশু বানিয়ে ছেড়েছে। শহিদ বলতে থাকে,

- দুটো জিনিসের মধ্যে যখন মিল দেখা যায় তখন এটা মনে করা স্বাভাবিক যে তারা একই উৎস হতে এসেছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, উৎস বলতে কেবল বংশ সম্পর্ক বোঝায় না বরং একই স্রষ্টা যখন দুটি জিনিসকে সৃষ্টি করেন তখনও এটা বলা যায় যে, তাদের উৎস একই। অতএব দুটো জিনিসের মধ্যে মিল থাকলেই বংশ সম্পর্ক দাবী করা উচিৎ নয় বরং আগে দেখতে হবে তাদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক থাকা সম্ভব কিনা। যদি দুটো ছেলে বা মেয়েকে দেখতে এক রকম মনে হয় তবে আপনি বলতে পারেন এরা একই পিতা-মাতার সন্তান বা একই বংশের লোক। যেহেতু তারা

সবাই মানুষ অতএব, তাদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক থাকাটা সম্ভব। কিন্তু আপনি অবশ্যই এমন বলবেন না যে, তারা দুজন একই মুরগির ডিম থেকে জন্ম নিয়েছে। যেহেতু এটা সম্ভব নয়। একইভাবে বানর বা গরিলার সাথে মানুষের মিল দেখে তারা সবাই একই প্রাণীর বংশধর এমন দাবী করাটা কখনও বৈজ্ঞানিক দাবী নয়। যেহেতু তাদের মাঝে কোনো বংশ সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। এটা যেমন আমরা ঘটতে দেখিনি এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় নি। অতএব, বানর ও মানুষের মধ্যে বংশ সম্পর্ক দাবী করাটা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন?

পন্ডিত সাহেব কিছু বলেন না। তিনি এত শীঘ্র স্বীকার করতে চান না। শহিদ আবার বলে,

- তাছাড়া দুনিয়ার যত প্রাণী আছে তাদের মধ্যে যতটুকু মিল আছে তার চেয়ে অমিল আছে ঢের বেশি। ডারউইন কেবল মিলটা লক্ষ্য করেছে আর অমিলটা এড়িয়ে গেছে। বলুন তো গরু আর পাখি দেখে কি আপনার মনে হয় এগুলো একই বংশের সদস্য?

পন্ডিত সাহেব এবার মাথা নাড়েন। গরু এবং পাখি একই বংশের হওয়াটা তার নিকট অসম্ভবই মনে হচ্ছে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শহিদ বলে,

- তাহলে মূল ঘটনাটা কি দাড়াচ্ছে? সৃষ্টি জগতের মধ্যে যেমন কিছু মিল আছে কিছু অমিলও আছে। মূল ঘটনা হলো, একজন মহান স্রষ্টা এ সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেন তিনি যতটুকু ইচ্ছা মিল রাখতে পারেন আবার যতটুকু ইচ্ছা অমিলও রাখতে পারেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে এই মিল ও অমিলের এটাই হলো সঠিক ব্যাখ্যা।

এবারও পন্ডিত সাহেব নিরব থাকেন। তিনি এখনও পর্যন্ত পণ করে বসে আছেন- সব কিছু স্বীকার করলেও স্রষ্টাকে স্বীকার করবেন না। তাকে নিরব দেখে শহিদ যোগ করে,

- ডারউইন যে বলেছে একটা প্রাণী বিবর্তিত হয়ে আরেকটা প্রাণীতে পরিনত হয়। এটা কিভাবে হয় তা জানেন কি?

পন্ডিত সাহেব বিষয়টি জানেন। খুক খুক করে কেশে নিয়ে তিনি বলেন,

- ডারউইনের মতে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রাণীদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। এভাবে তাদের বংশধররা একটু একটু করে বিবর্তিত হয়ে এক সময় ভিন্ন একটা প্রাণীতে পরিনত হয়। উদাহরণস্বরুপ কিছু জেব্রা গাছের মগ ডালের পাতা খেতে চেয়েছিল তাই আস্তে আস্তে তাদের গলা লম্বা হয়ে যায়। এভাবে

জেব্রা থেকে জিরাফে পরিনত হয়।

কথাটি শুনে কেউ কেউ শব্দ করে হেসে ওঠে। শহিদ লক্ষ্য করে একেবারে পিছনে দাড়িয়ে থাকা সব চেয়ে কম বয়সের ছেলেটি অধিক শব্দ করে হাসছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পন্ডিত সাহেবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে বলে,

- এই মতবাদে দুটি মারাত্মক ভুল আছে। প্রথমত মগডালের পাতা খেতে চাইলেই গলা লম্বা হয়ে যাবে কথাটা সঠিক নয়। প্লেন আবিষ্কার করার আগে মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়তে চাইতো। কেউ কেউ কৃত্রিম পাখা লাগিয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে ওড়ার চেষ্টা করেছে। এরপরও কিন্তু তাদের পাখা গজিয়ে যায় নি। আমি যদি এখন মনে করি এই হাত দিয়ে আঘাত করে ইটের দেওয়াল ভেঙে ফেলবো তাহলে আমার হাত হাতুড়ি হয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত যদি কোনো ভাবে জোর করে মানুষের শরীরে কোনো পরিবর্তন করা যায়ও তবু তার সন্তানের মধ্যে সেটা প্রভাব বিস্তার করবে না। ধরুন স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণে বের হলো। হঠাৎ ট্রেনের নিচে পড়ে তাদের উভয়ের পা কেটে গেলো। এর পর তাদের যে সন্তান হবে তার কি পা কাঁটা হবে?

পন্ডিত সাহেব মাথা নেড়ে বিষয়টিকে নাকোচ করেন। তার মুখের উপর চোখ রেখেই শহিদ বলে,

- তাহলে একটি প্রাণীর শরীরে সারজীবনে যত পরিবর্তনই আসুক তার পরবর্তী বংশধরের শরীরে তার কোনো প্রভাব পড়বে না। ঠিক কিনা?

পন্ডিত সাহেব মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করে সম্মতি প্রকাশ করলে শহিদ বলে,

- তাহলে একটা প্রাণী আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে আরেকটা প্রাণীতে পরিণত হওয়ার গল্পটা একটা বানোয়াট গল্প এটা কি বুঝতে পারছেন?

বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়ার বদলে পন্ডিত সাহেব একটা প্যাচ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

- তবে কি তুমি বলছো একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি হতে পারে না? যতদূর জানি কুরআন-হাদিসে মানুষ থেকে বানর হয়ে যাওয়ার একটা ঘটনা আছে। কি নেই?

নাস্তিকের মুখে কুরআন হাদীসের কথা শুনে শহিদ বেশ মজা পায়। আড় চোখে তাকিয়ে দেখে ইমাম সাহেব মজা করে হাসছেন। সেই হাসির সাথে তাল মিলিয়ে হাসতে হাসতে সে বলে,

- তা আছে বটে কিন্তু তাতে নাস্তিকদের শেষ রক্ষা হবে না। নাস্তিকরা বলে এমনি এমনি একটা প্রাণী ধীরে ধীরে আরেকটা প্রাণীতে পরিনত হয়। কিন্তু কুরআন-হাদীসে এসেছে, আল্লাহ একদল পাপী লোককে মানুষ থেকে বানরে পরিনত করেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে একটা প্রাণী থেক আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা মানি কিন্তু এমনি এমনি এমনটি হয় না সেটাই হলো মূল কথা। একটা উদাহরণ দিই, এখন হাটে-বাজারে প্লাস্টিকের চেয়ার-টেবিল পাওয়া যায়। সেগুলো ভেঙে গেলে কোম্পাণীর নিকট অর্ধেক দামে ফেরত দেওয়া হয়। কোম্পানী সেগুলো গলিয়ে আবার নতুন চেয়ার বা টেবিল তৈরী করে। কোম্পানী ইচ্ছা করলে একটা চেয়ার গলিয়ে টেবিল বা অন্য যে কোনো কিছু বানাতে পারে এটা সবাই মানবে। কিন্তু একটা চেয়ার একা একা গলে গিয়ে সুন্দর একটা টেবিলে পরিনত হলো এমন গল্প যদি কেউ করে তবে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা নাড়েন। শহিদ বলতে থাকে,

- বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বিভিন্ন রকম প্রাণী ও উদ্ভীদের গঠনে পরিবর্তন এনেছেন। যেমন সংকর প্রাজাতির গরু বা পোল্ট্রী মুরগি, হাইব্রিড ধান,গম টেমেটো ইত্যাদি। ভুলে গেলে চলবে না যে এগুলো সুক্ষ্ম পরিকল্পণা ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। একটা মুরগি নিজ থেকে পোল্ট্রী মুরগীতে রুপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এমন নয়। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যে মুরগিটি বিজ্ঞানীদের গবেষণা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে সেও এমনি এমনি সৃষ্টি হয় নি বরং তার সৃষ্টিতে অন্য একজন মহা বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে।

কথাটি বলে কিছুক্ষণ নিরব থাকে শহিদ। পন্ডিত সাহেবও নিরব থাকেন। এবার শহিদ বিবর্তনবাদ সম্পর্কে তার শেষ কথাগুলো বলা শুরু করে,

- দেখুন পন্ডিত সাহেব, বিবর্তনবাদের সর্বাপেক্ষা বড় ফাঁকটি হলো, এখানে একটা প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে আরেকটি প্রাণী সৃষ্টি হয় এমন বলা হয়েছে। যেমন ধরুন একটি বানর ধীরে ধীরে মানুষে পরিনত হলো। এটা কিন্তু এক রাতে হয় না বরং কোটি কোটি বছর ধরে হয়। তাহলে হঠাৎ একটি বানর মানুষ হয়ে যায় এমন নয় বরং বানর থেকে একটু একটু পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি হতে হতে মানুষ পর্যন্ত পৌছায়। ধরুন বানর থেকে একটি প্রাণী সৃষ্টি হলো যার লেজ ছোট হয়ে গেলো। এর পর সেই প্রাণী থেকে আরেকটি প্রাণী সৃষ্টি হলো যার লেজ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেলো কিন্তু গায়ে লোম থাকলো। এরপর মানুষের মতো একটা প্রাণী তৈরী হলো কিন্তু সে কথা বলতে পারে না। পরে কথা বলতে পারে এমন একটা মানুষ সৃষ্টি হলো। কি এভাবেই তো হবে নাকি পন্ডিত সাহেব?

পন্ডিত সাহেব সম্মতি দেন। তিনি যতদূর জানেন এক রাতের মধ্যে এক পাল বানর মানুষে পরিনত হয়ে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসবে বিবর্তনবাদ এমন বলে না। বরং বিবর্তনবাদ বলে, একটি প্রাণী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে আরেকটি প্রাণীতে পরিণত হবে। শহিদ যা বলেছে ব্যাপারটি এমনই।

পন্ডিত সাহেবের সম্মতি পেয়ে শহিদ বলে,

- তাহলে বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বানর থেকে মানুষে পরিনত হতে লক্ষ কোটি প্রাণীর সৃষ্টি হওয়ার কথা যারা দেখতে বানর বা মানুষের কাছাকাছি হবে। কিন্তু আমরা দেখি বানর আছে আবার মানুষও টিকে আছে কিন্তু মাঝের প্রাণীগুলো গেলো কোথায়? এভাবে যদি বলা হয় বানর ও মানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হয় সেই পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে যত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো গেলো কোথায়?

পন্ডিত সাহেব সহজভাবে বলেন,

- ডারউইন বলেছেন, প্রাকৃতিকভাবে অধিক যোগ্য প্রাণীটি টিকে থাকবে আর অযোগ্য প্রাণীগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ সকল প্রাণীগুলো অযোগ্য তাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এটাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন।

শহিদ তেজস্বী কণ্ঠে বলে ওঠে,

- দেখুন পন্ডিত সাহেব, ডারউইন তো আর ঐ সকল প্রাণীদের আধ্যাত্মিক নেতা নন যে তিনি বললেই তারা একযোগে আত্মহত্যা করবে। প্রাণীদের ধর্মই হলো টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম কারা। কাউকে অযোগ্য বললেই সে লজ্জায় আত্মহুতি দেবে এমন নয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কোষী প্রাণীরা টিকে আছে, টিকে আছে অতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক। মানুষের কাছাকাছি বলতে গেলে মানুষের প্রায় সমান যোগ্যতা সম্পন্ন বিশাল সংখ্যক প্রাণী এক যোগে ধ্বংস হয়ে গেলো? বিষয়টা কি পাগলের প্রলাপ নয়!

পন্ডিত সাহেবের নিকট বিষয়টি এখন পাগলামী বলেই মনে হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন ডারউইন নামে এক পাগল বহু পূর্বে কিছু আজগুবী কল্প-কাহিনী লিখে গিয়েছে আর তার মতো গাধা পন্ডিতরা সেটার পক্ষে ওকালোতী করে অযথা সময় নষ্ট করছে। অনেকটা বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন,

- তাহলে এসব ডারউইন ফারউইন ছেড়ে আমরা ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি।

শহিদ কিন্তু অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- তাহলে স্বীকার করুন বিবর্তনবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

পন্ডিত সাহেব কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকেন। তারপর মাথা তুলে একবার হাসমত সাহেবের দিকে তাকান যেনো এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মুরব্বীর মতামত নেওয়ার চেষ্টা করছেন। হাসমত সাহেব নিজেও সম্পূর্ণ আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। শহিদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় তার নিকটও নেই। তিনি কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে ধরে চিন্তা করলেন। তারপর নিজের মাথাটি উপর থেকে নিচে কয়েকবার ঝাকিয়ে সম্মতি প্রদান করলেন। নিরুপায় হয়ে পন্ডিত সাহেব নিজেও মাথা ঝাকিয়ে বললেন,

- আমি স্বীকার করছি।

সাথে সাথে পিছন দিক থেকে ইমাম সাহেব চিৎকার করে বললেন,

- নারায়ে তাকবীর।

উপস্থিত মুছল্লীরা একযোগে বলে উঠলো,

- আল্লাহু আকবার।

এভাবে কিছুক্ষণ তাকবীর চলতে থাকে। সে সময়টায় পন্ডিত সাহেব একই সাথে আতংকিত ও অপমানিত বোধ করছিলেন। তার ইচ্ছা করছিল কানে আঙ্গুল পুরে দিতে। কিন্তু সেটা অধিক অপমানকর হবে ভেবে তিনি বিরত থাকেন।

নাস্তিকদের আড্ডাখানা থেকে তাকবিরের শব্দ শোনা যাচ্ছে দেখে এলাকার লোকজন ভীষণ অবাক হয়ে যায়। সব কাজ-কাম ফেলে তারা ছুটে আসে ঘটনা কি দেখার জন্য। পাঠাগারের ভিতরে তো বটেই এমন কি বাইরের আঙিনাতেও লোকজনের ভিড় জমে যায়। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে শহিদ বলে,

- পন্ডিত সাহেব, এখন কি আপনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করবেন?

পন্ডিত সাহেব গোমড়া মুখটা আরেকটু ফুলিয়ে হালকা ভাবে মাথা নেড়ে বলেন,

- ভেবো না সব শেষ হয়ে গেছে। তর্কের এখনও অনেক বাকী।

নাস্তিকরা এতক্ষণ মুখ চুন করে বসে ছিল। পন্ডিত সাহেবের কথা শুনে তাদের মধ্যে যেনো কিছুটা আশার সঞ্চার হলো। সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল। পন্ডিত সাহেব শহিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

- যে সূত্র দিয়ে তুমি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করছো সেই সুত্র দিয়েই যে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় তা কি তুমি জানো?

লোকটি কি বলতে চাচ্ছে শহিদ বুঝতে পারে। এটাই নাস্তিকদের শেষ হাতিয়ার। যখন তাদের বলা হয় কোনো স্রষ্টা ছাড়া এ সুবিশাল সৃষ্টি কোথা থেকে আসলো? তারা বলে তাহলে স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো? এ প্রশ্নটি কিন্তু মোটেও নতুন প্রশ্ন নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগেও এমন লোক ছিল। হাদীসের মধ্যে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এই লোকটি যে এখন এই প্রশ্নটিই করবে শহিদ তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে তবু সমবেত জনতা এই ব্যক্তির মুখ থেকেই কথাটি শুনে নেওয়া ভাল এমন মনে করে সে বলে,

- কি বলতে চাচ্ছেন খোলোসা করে বলুন।

পন্ডিত সাহেব খুশি হলেন। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত এই প্রশ্নটির মাধ্যমে বিতর্ক অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে এবং তিনিই বিজয়ী হবেন। ফলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন,

- তুমি বলছো এই সুন্দর পৃথিবী, প্রাণীজগৎ ইত্যাদি যা কিছু আমরা দেখছি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভভ নয়। এই একই যুক্তি প্রয়োগ করে একথা কি বলা যায় না যে, স্রষ্টাকে তাহলে কে সৃষ্টি করলো? যদি তুমি বলো স্রষ্টা নিজে থেকেই আছেন তবে আমি বলবো, এই পৃথিবী বা অন্যান্য সৃষ্টিও নিজ থেকে আছে।

কথাটি বলে, খেল খেলিয়ে দিয়েছি এমন ভাব দেখিয়ে পন্ডিত সাহেব প্রথমেই উপস্থিত জনতার দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি লক্ষ্য করেন, জনতা প্রশ্নটিকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছে। নাস্তিক মহল বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে আর ইমাম সাহেবের মুখটি কিছুটা মলিন হয়ে গেছে। তার দুটি ঠোট অনবরত নড়ছে। হয়তো নাউযু বিল্লাহ পড়ছেন অথবা ভিন্ন কিছু পাঠ করে শহিদের জন্য দোয়া করছেন। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পন্ডিত সাহেব শহিদের দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি আশা করছিলেন প্রশ্নটি শুনে শহিদের মুখটিও মলিন হয়ে যাবে। কিন্তু তার সে আশা বিলীন করে দিয়ে শহিদের মুখে হাসির চিহ্ন ফুটে রয়েছে। তাকে নিশ্চিন্তে হাসতে দেখে পন্ডিত সাহেবের বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। তবে কি এই প্রশ্নটির উত্তরও তার কাছে আছে? তার নিজের মুখটিই এবার মলিন হয়ে যায়। পন্ডিত সাহেব তার দিকে ঘুরে তাকাতেই শহিদ বলে,

- আপনি এই যুক্তিটি স্রষ্টার উপর প্রয়োগ করতে চান?

পন্ডিত সাহেব অবুঝের মতো মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি প্রদান করেন। তার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রেখে শহিদ বলে,

- যুক্তি কি জিনিস এবং কোথায় তা প্রয়োগ করতে হয় তা কি আপনার জানা আছে?

পন্ডিত সাহেব নিরব থাকেন। তিনি এই কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারেন নি।

আবার জিজ্ঞাসা করেও লাভ নেই কারণ তিনি তাতেও বুঝবেন না। কেবল ফ্যাল-ফ্যাল করে শহিদের দিকে তাকাতে থাকেন। তার অজ্ঞতা অনুধাবন করে শহিদ বলে,

- আমরা চোখের সামনে যা কিছু দেখি তার উপর চিন্তা-গবেষনা করে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই বলা হয় যুক্তি। এই যেমন ধরুন, চাষীরা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল চাষ করে। তাদের যুক্তি হলো ঐ মৌসুমে ঐ সব ফসল ভাল ফলন হয়। এ যুক্তিটি তারা বহু দিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছে। একইভাবে আমরা বললাম, পুতুল কখনও পুতুলকে জন্ম দেয় না এবং একই পিতা-মাতার ঔরসে বানর ও মানুষ জন্মাতে পারে না। এটাও একটা যুক্তি যা আমরা দেখে দেখে শিখেছি। স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হতে পারে না এ যুক্তিটিও আমরা বিভিন্ন সৃষ্টির উপর গবেষণা করে অর্জন করেছি। আমাদের চারপাশে, আমাদের ধরা ছোয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো দেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যুক্তি কাকে বলে এখন কি আপনি বুঝতে পারছেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা ঝাকান। তিনি এখন বুঝতে পারছেন। শহিদ বলতে থাকে,

- মোট কথা স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয় এই যুক্তিটি আমরা সৃষ্টির উপর গবেষণা করে অর্জন করেছি যা আমাদের ধরা-ছোয়ার মধ্যে রয়েছে। অতএব, এই যুক্তি আমরা যাকে দেখিনি সেই স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। নিম ফল খেয়ে আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা আম-কাঠালের উপর প্রয়োগ করা যাবে না। যেখানকার যুক্তি সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। সৃষ্টির উপর গবেষণা করে যে যুক্তি পাওয়া গেছে তা কেবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে অদৃশ্য স্রষ্টার উপর তা প্রয়োগ করা সঠিক নয়।

পন্ডিত সাহেব বুঝতে পারেন তার প্রশ্নটির সমাধান হয়ে গেছে। তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। শহিদ অবশ্য এখনও কথা শেষ করে নি। সে বলতে থাকে,

- আপনি বলেছেন যদি বলা হয় স্রষ্টা নিজ থেকেই আছেন তাহলে আমি বলব, আকাশ-পৃথিবী বা অন্যান্য সৃষ্টিও নিজ থেকে আছে। এর সহজ উত্তর হলো, আমরা যেসব সৃষ্টিকে দেখছি সেগুলো যে স্রষ্টা ছাড়া হতে পারে না সে ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। অতএব, নিজ থেকেই আছেন কথাটি কেবল এমন কোনো সত্ত্বার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় যাকে আমরা এখনও দেখিনি ফলে তার ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।

পন্ডিত সাহেব কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,

- যাকে দেখি নি এমন একটা অস্তিত্ব আমরা কেনো কল্পণা করবো?

তার কথার উত্তরে শহিদ বলে,

- কারণ, যা কিছু দেখছি সেগুলো আমাদের এমন একটা অস্তিত্ব কল্পণা করতে বাধ্য করছে। ধরুন আপনি একটা জঙ্গলে গেলেন। দেখলেন সেখানে একটি কুড়ে ঘর, ঘরের মধ্যে বিছানায় দুটি এক দেড় বছরের ছোট বাচ্চা শোয়ানো আছে। বাইরে একটি চুলার উপর ভাতের হাড়ি যার নিচে টগবগ করে আগুন ফুটছে। পাশেই একটা খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা আছে। ভাল করে চিন্তা করে বলুন, যুক্তির আলোকে আপনি এখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

কথাটি বলে শহিদ পন্ডিত সাহেবের দিকে দৃষ্টি দেয়। পন্ডিত সাহেব মুচকি হাসেন। তিনি ব্যাপারটি বুঝে ফেলেছেন। মুখের হাসিটি গোপন করার চেষ্টা করে তিনি বলেন,

- আমি ধরে নেবো আশে-পাশে এমন কেউ আছে যে চুলায় আগুন জ্বালিয়েছে এবং কুড়ে ঘরটি নির্মাণ করেছে।

কথাটা আশানুরূপ হয়েছে দেখে শহিদ খুশি হয়ে বলে,

- উপস্থিত নেই এমন একটা লোকের কথা আপনি কেনো কল্পণা করবেন? আপনি কেনো মনে করবেন না যে, হয়তো বাচ্চা দুটো বা ছাগলটা কুড়ে ঘরটা নির্মাণ করেছে এবং চুলায় আগুন জ্বেলে ভাত রান্না করছে?

কিছুক্ষণ নির্বিকার ভাবে শহিদের দিকে তাকিয়ে থেকে পন্ডিত সাহেব বলেন,

- কারণ, আমি বুঝতে পারছি যারা উপস্থিত আছে তারা কেউ কুড়ে ঘর নির্মাণ করা বা উনুন জ্বালিয়ে ভাত রান্না করতে সক্ষম নয়।

বিজয়ীর মতো হেসে শহিদ বলে, অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদের দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে অদৃশ্য একজনের উপস্থিতি সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করতে হলে একমাত্র সমাধান হলো এমন একজন স্রষ্টাকে স্বীকার করে নেওয়া যার দুটি গুণ থাকবে। এক. তাকে কেউ সৃষ্টি করবে না, দুই. অন্য সকল কিছু সৃষ্টি করার মতো জ্ঞান ও ক্ষমতা তার থাকবে। পৃথীবী এবং অন্যান্য যেসব সৃষ্টি আমরা চোখের সামনে দেখছি সেগুলোর এ দুটি গুণ নেই এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। যেহেতু সেগুলো আমাদের চোখের সামেন রয়েছে, এবং সেসব ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আমরা জানি এরা নিজেরা স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে না এবং এসব সৃষ্টির কেউ অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। তাই বাইরের একটা শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যুক্তিটি এতটাই স্পষ্ট যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পন্ডিত সাহেব বিষয়টি বুঝে ফেলেন। বিতর্কে তার পরাজয় যে সুনিশ্চিত এখন তিনি সেটিও বুঝতে পারছেন। এ পর্যায়ে

তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো নিজের পরাজয়কে ঢাকার জন্য পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করেন। কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ বলে ওঠেন,

- ইসলাম ধর্ম মানুষের গলা কাটে, মানুষকে দাস বানিয়ে রাখে, কুরবানীর সময় অকারণে কোটি কোটি পশু হত্যা করে, মেয়েদের সমান অধিকার দেয় না, পুরুষরা চারটে বিয়ে করে, সম্পত্তিতে বেশি অংশ নেয়। এ ব্যাপারে তোমার কি মন্তব্য?

হঠাৎ প্রসঙ্গ পবিরর্তন করার কারণে শহিদ ভীষণ বিস্মিত হয়। নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে নিয়ে বলে,

- এসব বিষয়ের পক্ষে অকাট্য যুক্তি রয়েছে কিন্তু এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে প্রচুর সময়ের দরকার। এক বৈঠকে সব গুলো বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন।

পন্ডিত সাহেব আসলেই বিষয়টি বুঝতে পারছেন। তিনি বুঝে শুনেই এই কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি চান আজকের আলোচনাটি অমিমাংশিত ভাবে শেষ হোক। কোনো রকমে একটা ফাঁক ফোকর দিয়ে আজ বের হতে পারলে এ তল্লাটে দ্বিতীয়বার আর আসবেন না। সেই আশা নিয়ে বলেন,

- তাহলে আজকের আলোচনা অমিমাংশিত থেকে যাক। পরে যদি আমাদের আবার কখনও মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয় তাহলে বাকী আলোচনা সম্পন্ন করে নেবো। কি বলো?

শহিদ পন্ডিত সাহেবের মনের অবস্থা আঁচ করতে পারে। বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে,

- না, না। আলোচনা অমিমাংশিত রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আজ একটা ফলাফল বের করেই আমি শুনবো। এই সবগুলো প্রশ্নের আমি এক কথায় উত্তর দেবো। আর সেই উত্তরটিও হবে এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করেছি তার সূত্র ধরে। এর জন্য নতুন কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই।

কুট কৌশলটি ব্যার্থ হতে দেখে পন্ডিত সাহেবের অন্তরের মধ্যে খুট করে একটা শব্দ হয়। তবে কি তাকে আজ জন সম্মুখে পরাজয় বরণ করতেই হবে? নিরুপায় হয়ে তিনি কান খাড়া করে শহিদের এক কথার উত্তরটি শোনার জন্য অপেক্ষা করেন। শহিদ বলতে শুরু করে,

- প্রথমেই আপনাকে স্বীকার করতে হবে প্রচন্ড ক্ষমতাধর ও জ্ঞানী একজন অদৃশ্য স্রষ্টার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা। যদি বিশ্বাস করেন তবে স্বীকার করুন তা না হলে পূর্বে আমি যেসব যুক্তি পেশ করেছি সেগুলো খন্ডায়ন করুন।

পন্ডিত সাহেব যেনো খেই হারিয়ে ফেলেন। দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করতে হবে তা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন। শহিদের যুক্তি প্রমাণকে খন্ডায়ন করা তো কখনই সম্ভব নয়। গোঁয়ারতুমী অবশ্য করা যায়। কিন্তু সেটা করতে গেলে ঘর ভর্তি দর্শকের সামনে তিনি বোকা প্রমাণিত হবেন। তাল গাছটা আমার এই নীতিতে তো আর বিতর্কে বিজয়ী হওয়া যায় না। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ-মেষ তিনি বলেই ফেলেন,

- স্রষ্টা একজন অবশ্যই আছেন।

ইমাম সাহেব আবার তাকবীর দিয়ে ওঠেন। উপস্থিত মুসলিমরাও তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তাকবীর দেয়। সবাই নিরব হয়ে গেলে শহিদ বলে,

- তাহলে আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন সেগুলোর কোনো মানে হয় না। দেখুন, এখানে মুল বিষয়টি হলো, একজন মহা পরাক্রমশালী স্রষ্টার অস্তিত্ব। যদি আপনি এটা স্বীকার করে নেন তবে তিনি যে আদেশ করবেন সেটাই মানতে হবে আপনার বুঝে আসুক বা না আসুক, পছন্দ হোক বা না হোক। মনিবের সিদ্ধান্তের উপর অধীনস্ত চাকর-বাকরদের আপত্তি করা শোভা পায় না এটা কি আপনি মানেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি জানান। এই সহজ মূলনীতিটি সবাই জানে। ওটা নিয়ে বিতর্ক করা চলে না। এর অর্থ হলো, স্রষ্টার দেওয়া বিধি-বিধানের উপর যেসব আপত্তি তিনি করেছেন তা এক কথায় সমাধান হয়ে গেলো। তিনি বুঝতে পারছেন পরাজয়ের একেবারে দারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন। সর্বশেষ যে যুক্তিটি তার মাথায় আসছে এবার তিনি তা পেশ করেন,

- স্রষ্টার অস্তিত্ব আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু ইসলাম ধর্ম যে তার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এর সকল বিধি-বিধান যে তারই বিধান সেটা কীভাবে প্রমাণ করবে? আমি স্রষ্টাকে মানি, কিন্তু তিনি যে কোনো ধর্ম পাঠিয়েছেন সেটা বিশ্বাস করি না।

শহিদ খুব শব্দ করে হেসে ওঠে। সম্ভবত সে নিজেও জানতো এই প্রশ্নটি তাকে করা হবে। এ প্রশ্নটিও সে এখন সহজে সমাধান করবে। তাকে ওভাবে হাসতে দেখে পন্ডিত সাহেব চোখের পাতা বুজিয়ে ফেলেন। তিনি চান না এই শেষ প্রশ্নটিও সমাধান হয়ে যাক। তার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে শহিদ বলে,

- মহাবিশ্বের স্রষ্টা তো বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল নাকি?

পন্ডিত সাহেব দ্রুত বলে ওঠেন,

- অবশ্যই বুদ্ধিমান। তিনি হলেন মহা জ্ঞানী বা বলা যায় মহা বিজ্ঞানী। এ জন্যই তো

তিনি মাহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

পন্ডিত সাহেব এমনভাবে স্রষ্টার প্রশংসা করেন যেনো তিনি এখন স্রষ্টার পক্ষে বিতর্ক করছেন আর শহিদ তার বিপক্ষে কথা বলছে। তার কথা শেষ হলে শহিদ বলে,

- দেখুন বাচ্চারা খেল-তামাশা করে কিন্তু বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল ব্যাক্তি কি অকারণে কিছু করে? মহাবিশ্বের স্রষ্টা আমাকে-আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের সকল প্রাণী ও অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের খাবারে ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জীবনকে সুসজ্জিত করেছেন। কোনো কারণ ছাড়াই কি তিনি এটা করেছেন নাকি এসবের পিছনে তার কোনো উদ্দেশ্য আছে? এখানে যৌক্তিক দাবী কোনটি?

পন্ডিত সাহেব নিরব থাকেন। এই মুহূর্তে বুকের ভিতরে তিনি একটা ব্যাথা অনুভব করছেন। শহিদ বলতে থাকে,

- কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে কেবল মাত্র পৃথীবিকে তিনি প্রাণের উপযুক্ত করেছেন। আমরা যত প্রাণীকে দেখতে পায় তার মধ্যে তিনি কেবল মানুষকে কথা বালা ও চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এত যত্ন করে যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের নিকট তিনি অবশ্যই কিছু একটা চান। আর সেটা হলো তার আনুগত্য তথা দাসত্ব করা। তাছাড়া মানুষের জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এই দুটি ভাগে মানুষ বিভক্ত। তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়াটাও বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীলের কাজ।

পন্ডিত সাহেব সম্মত হোন। এই সুবিশাল সৃষ্টিরাজি যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহান স্রষ্টা যে ন্যায় বিচার পতিষ্ঠিত করবেন এটাই স্বাভাবিক। খেল তামাশা নয় বরং কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তিনি এ সৃষ্টিরাজিকে সৃষ্টি করেছেন এটাই যৌক্তিক। তার সম্মতি পেয়ে শহিদ বলে,

- কিন্তু বিচার করার আগে তো আইন-কানুন গুলো মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা কি কাজ করবে কি কাজ করবে না, কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায় সেটিও বলে দিতে হবে, তাই না? এমন কোনো রাজার কথা শুনেছেন যে পূর্বে থেকেই নিজের আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন মানুষের সামনে প্রকাশ না করেই মানুষকে বিচারের মুখোমুখি করে?

পন্ডিত সাহেব মাথা নাড়েন। এমন কথা তিনি কখনও শোনেন নি। তাছাড়া বিষয়টি যৌক্তিকও নয়। মহান স্রষ্টা এমন অবিবেচকের মতো কাজ করতে পারেন না। শহিদ বলতে থাকে,

- তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মহান স্রষ্টা তার বিধি-বিধান ও আইন-কানুন

মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করবেন। একারণেই তিনি রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

পন্ডিত সাহেব আপত্তি করে বলেন,

- তিনি নিজে কেনো আমাদের সামনে এসে বিষয়গুলো জানিয়ে দেন নি?

কণ্ঠস্বর কছুটা উঁচু করে শহিদ বলে,

- পন্ডিত সাহেব, আপনার এই কথা মহান স্রষ্টার সম্মানের সাথে খাপ খায় না। চিন্তা করুন তো, যদি রাজ্যের প্রতিটি প্রজা দাবী করে রাজা নিজে এসে আমাদের সামনে আদেশ না করা পর্যন্ত আমরা তার কথা শুনবো না তবে এটা কি বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে না? যদি রাজা নিজের পেয়াদা পাঠিয়ে কোনো একজন প্রজাকে একটা আদেশ করে আর সে বলে রাজাকে আমার বাড়ি এসে কথাটা বলে যেতে হবে তবে এটা কি তাকে অপমান করা নয়? যে কোনো মাধ্যমে বিধান পৌঁছে যাওয়াই কি তা মেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়?

পন্ডিত সাহেব কিছুটা প্যাচ মারার চেষ্টা করেন,

- সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টাকে দেখার ইচ্ছা থাকাটা কি অন্যায়? প্রজারা যদি রাজাকে দেখার ইচ্ছা করে, সরাসরি তার কথা শুনতে চায় তবে কি রাজা রাগ করে?

- দেখার ইচ্ছা তো থাকতেই পারে কিন্তু তিনি যখন যেখানে দেখা দিতে চান সেখানে দেখা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসতে হবে। তা না হলে তার আদেশ মানবো না এটা কি সঠিক হবে? আল্লাহ আখিরাতে মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, কথা বলবেন। আমাদের সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। আমাদের বাসস্থানে তিনি অবতরণ করুন এই দাবী করবো না। বুঝতে পেরেছেন?

পন্ডিত সাহেব ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। মহান স্রষ্টার প্রতি ধীরে ধীরে কিছুটা শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হচ্ছে তার। শহিদ বলতে থাকে,

- তাহলে স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটা বার্তা অবশ্যই পাঠানো হয়েছে। স্রষ্ঠার মনোনিত একটা ধর্ম অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা কোনটি তাই না?

পন্ডিত সাহেব বেশ জোরে জোরে মাথা ঝাকাতে থাকেন। আসলে এই মুহুর্তে তার অন্তরে কেবল এই প্রশ্নটিই ঘুর-পাক খাচ্ছে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শহিদ বলে,

- যদি স্রষ্টাতে বিশ্বাস করেন এবং তিনি যে একটা বিধান বা ধর্ম প্রেরণ করেছেন

এটা বিশ্বাস করেন তবে বাকী কাজটা খুবই সহজ। দুনিয়াতে যেসব ধর্ম আছে সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণা করে দেখুন। খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এগুলোর মধ্যে স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসেছে কোন ধর্মটি। আপনার চিন্তার সুবিধার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। ইসলাম ধর্মের আগমণের ইতিহাসটি স্মরণ রাখবেন। একজন ব্যক্তি যিনি তার যুগের সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠতার কারণে সর্বমহলে প্রসংশিত ও পরিচিত ছিলেন। লোকে তাকে আল-আমীন উপাধীতে ডাকতো, যার অর্থ বিশ্বস্ত। তিনি সমাজের সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করতেন সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করতেন। দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করার জন্য হিলফুল ফুজুলের মতো সংগঠনে যোগ দিতেন। এভাবে জীবনের অর্ধেকটা সময় পার করে দেন। শেষে সমাজের অবস্থায় ব্যাথিত হয়ে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে তার নিকট ফেরেশতা আগমণ করেন। ফেরেশতা দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান। এই ঘটনার পর তিনি এতটা সন্ত্রস্ত পড়েন যে, এমন কি তার স্ত্রী খাদেজা বাধ্য হয়ে তাকে একজন খৃষ্টান পন্ডিতের কাছে নিয়ে যায়। যিনি তাকে বলেন, আসলে যে এসেছিল সে ছিল ফেরেশতা। অর্থাৎ ফেরেশতা বা ওহী এসব ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। এরপর একের পর এক ওহী হতে থাকে। কখনও এমন হতো যে তিনি গাধার উপর সওয়ার আছেন বা বিশ্রামরত আছেন সেই অবস্থায় তার উপর ওহী নাযিল হতো আবার কখনও এমন হতো যে, একদল লোক তার কাছে প্রশ্ন করেছে তিনি সেটার উত্তর দিতে চান কিন্তু পনের দিন যাবত ওহী নাযিল হয় নি বিধায় উত্তর দিতে পারে নি। পরে ওহী নাযিল হলে উত্তর দিয়েছেন। এটা প্রমাণ করে ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন ছিল না। সর্বপরী তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জীবনে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জ্ঞান অর্জন করেছেন তারও প্রমাণ নেই। অতএব, তার মুখ দিয়ে যেসব জ্ঞানের কথা বের হয়েছে সেগুলো অর্জন করার অন্য কোনো ছিল না। অর্থাৎ সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে নাযিল হয়েছে। ওহী নাযিলের পরের জীবনটুকুও তিনি সমাজ সংস্কার ও দ্বীনের দা'ওয়াতে ব্যস্ত থাকেন। একটি রাষ্ট্রের নায়ক এবং বহু সংখ্যক মানুষের চোখের মনি হওয়া সত্যেও জীবনে কখনও ভোগ-বিলাশে লিপ্ত হোন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অভাব অনটনের মধ্যে তার দিন কেটেছে। এমন কি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার একটা বর্ম এক ইয়াহুদীর নিকট ছিল যা বন্ধক রেখে তিনি কিছু যব গ্রহণ করেছিলেন। এসবই হলো, প্রশিদ্ধ ঘটনা যার কোনো অংশ অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব ঘটনা অস্বীকার করলে পৃথীবিতে ইতিহাস বলে কিছু থাকবে না।

এতদূর বলে, শহিদ পন্ডিত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে,

- কমপক্ষে মুহাম্মাদ নামে একজন ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়সে নিজের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হয়েছে এমন দাবী করেছিল আপনি কি তা অস্বীকার করতে পারেন?

পন্ডিত সাহেব মাথা নাড়েন। তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। শহিদ বলতে থাকে,

- এখন হয়তো কেউ বলতে চায় তিনি মিথ্যা দাবী করেছেন কিন্তু বহু সংখ্যক কারণে এ মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত জীবনে কখনও তিনি মিথ্যুক ও ঠগ ছিলেন না, দ্বিতীয়ত মিথ্যা বলার তার কোনো কারণ ছিল না, যেহেতু নিজেকে নবী দাবী করে তিনি দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ হাসিল করেন নি। কাফিররা বারবার তাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কালেমার দা'ওয়াত থকে বিরত রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি তাতে রাজি হোন নি। একারণে তিনি কঠিন জুলুম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। যখন তিনি নবুয়ত পাওয়ার দাবী করেন তখন ঘূর্ণাক্ষরেও এটা কল্পণা করেননি যে, দশ/বরো বছর পর তিনি রাষ্ট্র প্রধান হবে। রাষ্ট্র প্রধান যে হতে চায় তার জন্য নবুয়ত দাবী করে সমাজের সকল লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান করার মতো সংঘর্ষের নীতি সঠিক হতে পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার পরও তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাশে লিপ্ত হোন নি। এমনকি নিজের আত্মীয় স্মজনদের অধিক মোহাব্বত করা সত্ত্বেও পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাদের মনোনিত করে যান নি। অথচ ইসলামের নিয়মে যে কাউকে পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মনোনীত করার সুযোগ আছে। যেভাবে আবু বকর ﵁ হযরত উমরকে মনোনিত করে যান। তাছাড়া ঘটনার পরম্পরা তিনি মিথ্যা বলেছেন এটাকে সমর্থন করে না। উদাহরণস্বরূপ হেরা গুহাতে প্রথম ওহী নাযিলের পর তিনি নিজে মুখে এমন বলেন নি যে, আমার নিকট ফেরেশতা এসছে বা আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছে। বরং ওহী নাযিল হওয়ার পরই তিনি ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে আসেন। স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, আমি প্রান নাশের আশঙ্কা করছি। তার স্ত্রী তাকে শান্তনা দিয়ে বলেন, আপনি ভয় পাবেন না। আপনি তো ইয়াতীম-মিসকীনকে খাবার খাওয়ান, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। আল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি করবেন না। যে কোনো কিছু বানিয়ে বলে সে ঐ বিষয়ে পূর্ব থেকেই অবগত থাকে এবং নিজের মনের মধ্যে সেটা আগেই সাজিয়ে নেয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে, তিনি সত্যই কিছু একটা দেখেছেন এবং যা দেখেছেন সেটা তার কল্পণা বা চিন্তা-চেতনায় প্রথমে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে আগে থেকে অবগত ছিলনে না, যাকে দেখেছেন তাকে তিনি ফেরেশতা হিসেবে কল্পণাও করেন নি। উল্টো প্রাণ নাশের আশঙ্কা করেছেন। পরে ভিন্ন ধর্মের একজন ব্যক্তি যিনি আগে বা পরে কখনও তার অনুসারী ছিলেন না এবং তার মাধ্যমে তিনি কখনও কোনো স্বার্থ হাসিল করেন নি। পূর্ববর্তী কিতাবের উপর জ্ঞানের আলোকে তিনি বললেন যিনি এসেছিলেন তিনি ফেরেশতা। যে মিথ্যা বলে পারিপার্শিক বিষয়াবলী এভাবে তার

পক্ষে থাকে না। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হলো একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে যে গ্রন্থটি আমরা পেয়েছি, যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, তথ্য, মানবতার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি যে কোনো ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। অতএব, এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তা মেনে নিতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

পন্ডিত সাহেব ডান হাতের তর্জনিটি মুখে ভরে কিছুক্ষণ চিন্তা-মগ্ন থাকেন। স্রষ্টা আছেন, তার একটা ধর্মও আছে এতটুকু মেনে নিলে সেই ধর্মটি যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম নয় তা তিনি নিজেও জানেন। অন্য ধর্মের লোকদের কাজ কারবার আর চিন্তা-ভাবনা ছেলে মানুষী ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া বিজ্ঞানের সাথেও সেগুলো সাংঘর্ষিক। অতএব, মহান স্রষ্টা সেগুলো পাঠিয়েছেন এমন দাবী করা যায় না। হঠাৎ যেনো তার অন্তর খুলে গেলো বেশ জোরে জোরে মাথা ঝাকিয়ে বললেন,

- আমি মেনে নিলাম। তোমার সব কথা আমি মেনে নিলাম। সারাটা জীবন ধরে যা কিছু করেছি সব ভুল, সব অকারণ। তারপর হাত দিয়ে ইমাম সাহেবের দিকে ইশারা করে বলেন,

- মওলানা সাহেব দয়া করে একটু উঠে আসুন।

ইমাম সাহেব ডানে বায়ে তাকিয়ে দেখেন তিনি ছাড়া অন্য কোনো মওলানা এখানে আছে কিনা তার পর যখন নিশ্চিত হলেন তাকেই ডাকা হচ্ছে ধীর কদমে তিনি এগিয়ে গেলেন। তাকে আসতে দেখে পন্ডিত সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। ডান হাতটি প্রসারিত করে তার সাথে মোসাফা করেন এবং সরে গিয়ে নিজের চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলেন,

- দয়া করে আপনি আমার তওবা পড়িয়ে দেন।

কথাটি শুনে ইমাম সাহেব কিছুমাত্র অবাক হয়েছেন বলে মনে হলো না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভুল করলে তওবা করবে। হাদীসে এটাই বলা হয়েছে। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইমাম সাহেব খুব স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- আমি যা বলবো আপনি তাই বলবেন।

পন্ডিত সাহেব সম্মতি প্রকাশ করলে তার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ইমাম সাহেব বলতে শুরু করেন,

- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। ওয়া আশহাদ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

ইমাম সাহেব বেশ কাটা কাটা ভাবে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করছিলেন আর পন্ডিত

সাহেব ভাঙা ভাঙা ভাবে সেটার পুনরাবৃতি করছিলেন।

আরবী বাক্যটি শেষ হলেই ইমাম সাহেব বাংলা অর্থ বলতে শুরু করেন,

- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। তিনি এক তার কোনো শরীক নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসুল।

পন্ডিত সাহেব বাংলা অর্থগুলোও উচ্চারণ করলেন। তারপর যখন বুঝতে পারলেন তার তওবা শেষ হয়েছে তখন বললেন,

- আপনি একটু কষ্ট করে উপস্থিত অন্যান্য নাস্তিকদের তাওবা পড়িয়ে দেন। তাদের কারও কারও কিছু বিদঘুটে নাম আছে সেগুলো দয়া করে পাল্টে দেবেন। আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে বারোটার ট্রেন ধরতে হবে। আশা করি দ্রুতই আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে।

কথাটি বলে, পন্ডিত সাহেব শহিদের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দেন। তার পর দ্রুত বের হয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে হাসমত সাহেবও তার পিছু পিছু বের হয়ে পড়েন। তার দেখাদেখি মি. কচ্ছপ আর কদম আলী মাস্টাও সরে পড়তে চাচ্ছিলেন কিন্তু তারা ইমাম সাহেবের নজরে পড়ে যান। বেশ বাজখায় গলায় ইমাম সাহেব বলেন,

- এই যে, যাচ্ছেন কোথায়? আসেন তওবা পড়েন।

অগত্যা কি আর করা, প্রথমে কদম আলী মাস্টার এবং পরে মি. কচ্ছপ ইমাম সাহেবের হাতে হাত রেখে তওবা পড়ে নেন। এরপর জনতা একে একে সবগুলো নাস্তিককে ইমাম সাহেবের নিকট হাজির করতে থাকে আর তিনি তাদের তওবা পড়াতে থাকেন। প্রত্যেকের তওবা পড়ানোর পর তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করছিলেন। উল্টা-পাল্টা নাম হলে পাল্টে দিচ্ছিলেন। আর মাঝে মাঝে শহীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশংসাসূচক হাসছিলেন। তওবা পর্ব শেষ হলে শহিদ মাস্টার সাহেবকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

পাঁচ.

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ভাল ঘুম হয়না প্রফেসর সাহেবের। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস। সময়কে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কলেজে যাওয়ার আগে ক্লাসের

পড়া নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। কলেজ থেকে ফেরার পথে সারাদিনের খাবারের মেনু কি হবে সেটা চিন্তা করে ঠিক করে নেন। বিকালের দিকে ছাদে চেয়ার পেতে বসে নতুন কোনো কবিতা মেলানোর জন্য চিন্তা-ফিকির করেন। কিন্তু শহিদের সব কথা শোনার পর হতে তিনি কেবল একটি বিষয়ে চিন্তা করছেন। সত্যিই কি মহাবিশ্বের একজন পরাক্রমশালী স্রষ্টা রয়েছেন? যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এই সবুজে ভরা প্রকৃতি, নীল আকাশ, সারি সারি গাছ এ সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার অন্তরের ভিতর থেকে একটি কথায় কেবল প্রতিধ্বনি হতে থাকে,

- স্রষ্টা ছাড়া এ সুনিপুন সৃষ্টি কখনও সম্ভব নয়। কোনো পরিকল্পণা ছাড়াই হঠাৎ এগুলো সৃষ্টি হতে পারে না।

কিন্তু এ বিষয়ে তিনি এখনও পুরোপুরি সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন নি। এই সন্দেহ সংশয় তার মনোজগতকে এমনভাবে আবিষ্ট করে রেখেছে যে ক্লসে প্রায়ই তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করেন,

- স্রষ্টা ছাড়া কি সৃষ্টি সম্ভব?

ক্লাসের ছাত্ররা একযোগে বলে ওঠে,

- না, স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়।

তাদের কথা শুনে প্রফেসর সাহেব কিছুটা আশ্বস্ত হন কিন্তু তার সন্দেহ কাটতে চায় না। একসময় মনে হয় এই সন্দেহ সংশয়ের চক্রে ঘুরপাক খেয়ে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। এ কয় দিনে কয়েকবার তিনি শহিদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, এসব যুক্তি খন্ডায়ন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে, যুক্তি প্রমাণে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে কিভাবে? স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়কে সত্য হিসেবে গ্রহণ না করা তো পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। তিনি কি তবে পাগল হয়ে যাচ্ছেন? তিনি বেশ ভীত হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে পাগল হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। এখনই একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই মুহুর্তে হাসমত সাহেবের মনে পড়ে বাহাউদ্দিন নামে তার এক বন্ধুর কথা। সে মানসিক রোগের চিকিৎসা করে। হাসমত সাহেব ডাক্তারদের একদম পছন্দ করেন না। তিনি প্রায়ই বলেন, ডাক্তার আর ডাকাত একই জিনিস। গরীব মানুষকে ঠকিয়ে টকা কামাই করা তিনি চিরকাল অপছন্দ করেন। তবে বাহাউদ্দিনের কথা ভিন্ন। তিনি একজন অভিজ্ঞ মানসিক ডাক্তার। নামাযী লোক। সপ্তাহে একদিন গরীব মানুষদের

ফ্রী চিকিৎসা দেন। তার চেম্বারে সাক্ষাৎ না করে ফোনে যোগাযোগ করলেও বিস্তারিত পরামর্শ দিতে কৃপণতা করেন না। তার এসব গুণাবলীর কারণে নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হাসমত সাহেব এই নামাযী লোকটাকে পছন্দ করেন। তার উপর খুব দৃঢ়ভাবে ভরসাও করেন। কোনো সমস্যা হলে তিনি ফোনে তার কাছে পরামর্শ নেন। একবার তার ভীষণ জ্বর আর সর্দি-কাশি হয়। কোনো ডাক্তারের উপর ভরসা করতে না পেরে শেষে তিনি বাহাউদ্দিনের কাছে ফোন দেন। রোগের ধরন শুনে বেশ জোরে হেসে ওঠেন তিনি। হাসতে হাসতে বলেন,

- আমি তো ভাই মানসিক রোগের চিকিৎসা করি, আর তোমার তো শারিরিক রোগ।

এরপর তিনি অবশ্য তাকে এ বিষয়েও কিছু পরামর্শ দেন। সত্য বলতে শারিরিক রোগের চিকিৎসায়ও তিনি যে বেশ দক্ষ হাসমত সাহেব বেশ কয়েকবার তার প্রমাণ পেয়েছেন। হাসমত সাহেব বর্তমানে যে সমস্যায় রয়েছেন তা নিশ্চয় মানসিক সমস্যা। অতএব, বাহাউদ্দিনের সাথে যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করা একান্ত জরুরী। সেদিন রাতেই হাসমত সাহেব বাহাউদ্দিনকে ফোন করেন। ও প্রান্ত থেকে ফোন রিসিভ করেই কাটা কাটা কথায় সালাম দেন ডাঃ বাহাউদ্দিন।

- আস-সালামু আলাইকুম, কে বলছেন?

- ওলাইকুম সালাম, বাহা, আমি হাসমত বলছি।

- ও..হো ... হাসু? কেমন আছো? তা তুমি আজ পর্যন্ত সালামের জবাবটাও শিখলে না।

প্রফেসর সাহেবে ভীষণ লজ্জা অনুভব করেন। সালাম-কালাম শুদ্ধ করে দেওয়ার মতো বন্ধু তার কমই আছে। তিনি ওঠা-বসা করেন মুক্তাঙ্গনের গোঁড়া নাস্তিকদের সাথে। শুদ্ধ করে সালাম দেওয়া তো দূরের কথা তারা সালাম না দিতে পারলেই বাঁচে। হাসমত সাহেব হেসে বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করে বলেন,

- এবার শিখে নেবো। তা তোমার পাগলা গারদ কেমন চলছে?

গোঁড়া থেকেই হাসমত সাহেব তার বন্ধুর চেম্বারটিকে পাগলা গারদ বলে থাকেন। বাল্যকালের বন্ধুর পক্ষ থেকে এধরণের উক্তি বাহাউদ্দিন স্বাভাবিকভাবেই নেন। হালকা হেসে তিনি বলেন,

- আল্লাহর ইচ্ছায় চলছে ভাল তবে এই গারদে তোমাকে আবার ভর্তি না হতে হয়! সুক্ষ্মভাবে হিসাব করলে তুমিও তো পাগলদের কাতারেই পড়ো তাই না?

অন্য কেউ পাগল বললে হাসমত সাহেব বেজায় রাগ করেন কিন্তু বাহাউদ্দিনের কথা

ভিন্ন। তিনি মানিসক রোগীদের ডাক্তার। নিজের মনে কোনো রোগ থাকলে তার কাছে সেটা প্রকাশ করতেই হবে গোপন করে লাভ নেই। বাহাউদ্দিনের সামনে তাই নিজেকে পাগলদের কাতারে দাড় করাতে হাসমত সাহেব লজ্জা অনুভব করেন না। তার কথার সূত্র ধরেই বলেন,

- বুঝলে বাহা, এবার মনে হয় আমি পাগলই হয়ে যাবো। বেশ গুরুতর সমস্যায় পড়েছি।

ছেলে বেলার বন্ধুর সাথে ছেলেমী করার শখ সহজে মেটে না। তাই বোধ হয় গুরুতর সমস্যার কথা শুনেও বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার পরিবর্তে আবার মসকরা শুরু করেন বাহাউদ্দিন।

- সর্দি-কাশি বা ডায়রিয়া জাতীয় সমস্যা নাকি?

বাহাউদ্দিনকে ঘটনার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কিছুটা গম্ভীর স্বরে হাসমত সাহেব বলেন,

- আরে না তুমি কি হাতুড়ে ডাক্তার যে, তোমার কাছে সর্দি-কাশির চিকিৎসা নেবো?

- যখন সর্দি-কাশির চিকিৎসা নিয়েছিলে তখন বোধ হয় হাতুড়ে ডাক্তার ছিলাম, তাই না?

বাহাউদ্দিনের মন্তব্যে বিষয়টিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। হাসমত সাহেব নিজেও আরেকবার হেসে ওঠেন। তারপর প্রাণপন চেষ্টা করেন বন্ধুকে এবারের সমস্যাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।

- দেখো বাহা, একটু গুরুত্বসহকারে শোনো। এবার আমি সত্যিই একটা মানসিক সমস্যায় ভুগছি।

বাহাউদ্দিন এবার ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। ছেলেমী ছেড়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

- কি সমস্যা? খুলে বলো, আমি শুনছি।

হাসমত সাহেব চালাক মানুষ, তিনি সমস্যা খুলে বলবেন না। সমস্যার কিছু অংশ বলবেন আর কিছু গোপন করবেন। বাকীটা বাহাউদ্দিনকে অনুমান করতে হবে। তিনি দেখতে চান গত বিশ বছরে বাহাউদ্দিন কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এর মাধ্যে অবশ্য আরেকটি সুবিধাও আছে। বাহাউদ্দিনের পরামর্শের উপর আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

- সমস্যা হলো আমি খুব দুঃচিন্তার মধ্যে আছি। একটা ব্যাপারে আমি সন্দেহের মধ্যে

আছি অথচ সে ব্যাপারে সন্দেহ করা আমার উচিৎ নয়। কি ব্যাপার তা তোমাকে এখনই বলতে চাচ্ছি না। তুমি কি কিছু আঁচ করতে পারছো?

- দেখো হাসু, এটা দুই ক্ষেত্রে ঘটে। প্রথমত যখন মানুষ কোনো ব্যাপারে অধিক যত্নবান হয় এবং তার সুরক্ষার ব্যাপারে বেশি বেশি চিন্তা-ফিকির করে তখন সে ব্যাপারে সে অকারণেই দুঃচিন্তায় পতীত হতে পারে। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই সে মনে করবে অমুক জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেলো নাতো বা সেটা কেউ নিয়ে গেলো না তো? যাদের অনেক টাকা পয়সা আছে তারা টাকা পয়সার সুরক্ষার ব্যাপারে বা নেতা-নেত্রীরা নিজেদের ক্ষমতার সুরক্ষার ব্যাপারে এমন অকারণ দুঃচিন্তায় পতীত হতে পারে। অতি উৎসাহী যুবকরা নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে এমন সন্দেহে পতীত হয় সবচেয়ে বেশি। আমার জানা মতে তুমি নেতা নও, আহামরি খুব একটা বড় ধনীও নও, যতদূর জানি তুমি বিয়েও করোনি। অতএব তোমার সমস্যা এই প্রকারের নয় বরং দ্বিতীয় প্রকারের।

হাসমত সাহেব নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে থাকেন এতক্ষণ পর্যন্ত বাহাউদ্দীন হুবহু সঠিক কথাই বলেছেন। হাসমত সাহেবের দুঃচিন্তা টাকা-পয়সা, বা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নয়। এর পরে তিনি আর কি বলেন সেটাই দেখার বিষয়। বাহাউদ্দীন বলতে থাকেন,

- দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো, হয়তো তুমি কোনো বিষয়কে পছন্দ করো আর অন্য একটি বিষয়কে অপছন্দ করো কিন্তু যুক্তি-প্রমাণে তোমার মতটি ভুল প্রমাণিত হলো। এখন তুমি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে বা আহংকারের বশবর্তী হয়ে সত্য মেনে নিতে চাচ্ছো না। একারণে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তোমার মস্তিস্ক জোর করে কিছু সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে রাখছে। তুমি জানো সন্দেহ সংশয়গুলো ভিত্তিহীন তাই এগুলো মেনে নিতে পারছো না আবার সত্যকেও গ্রহণ করতে পারছো না। একারণে তুমি দোটানা ও দুঃচিন্তার মধ্যে রয়েছো।

বন্ধুর বিশ্লেষণ শুনে হাসমত সাহেব আবিভূত হয়ে যান। তার কথা পুরোপুরি সঠিক। নিজের বিস্ময়কে চেপে রেখে তিনি বলেন,

- তুমি ধরেছো তো ঠিক কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি সেটা বলো?

- ঔষধ আবার কি? নিজের অন্ধত্ব আর অহংকারকে মিটিয়ে ফেলে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। কোনো রকম লুকোচুরি না করে প্রকাশ্যে সত্যের স্বীকৃতি দিলেই সব দুঃচিন্তা দূর হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ।

ডাঃ বাহাউদ্দিন সমাধানটি সহজ ভাষায় শুনিয়ে দিলেন ঠিকই কিন্তু হাসমত সাহেবের পক্ষে তা বাস্তবায়ন করা যে কতটা কঠিন তা হয়তো তিনি বুঝতে পারছেন না।

হাসমত সাহেব আরও কিছুদিন দোটনা আর সংশয়ের মধ্যে দিন পাত করলেন তারপর একদিন ভয়ংকর একটা কাজ করে ফেললেন। কলেজ থেকে ফেরার পথে সোজা ঢুকে পড়লেন স্টেশন জামে মসজিদে। তিনি সিক্স বা সেভেনে যখন পড়তেন তখন দু'এক দিন নামাজ পড়তেন। তার বাবা ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাকে সাথে নিয়ে শুক্রবার দিন জুময়া পড়তে যেতেন তিনি। ওযু আর নামাযের প্রাথমিক ব্যাপারগুলো তার কাছ থেকেই শেখা। বড় হওয়ার পর থেকে নামাজ-রোজা বা ধর্ম কর্মে কোনো আকর্ষণ অনুভব করেন নি কখনও। কলেজ জীবনে নাস্তিকতার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রবেশ করেন দু'একজন নাস্তিক শিক্ষক আর উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে যান। এই এলাকাতে তাকে চেনে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রথমত প্রফেসর হিসেবে গত দুই/তিন দশকে তিনি যে কত ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়েছেন তার গোনতি নেই। সেই সব ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের অভিভাবকদের নিকট তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি। তাছাড়া তার উদ্ভট চেহারা-সুরত আর তার চেয়েও বেশি উদ্ভট চিন্তা-দর্শনের কারণে এলাকার সবার নিকট তিনি একটি পরিচিত মুখ। রাস্তা-ঘাটে তিনি কারও সাথে বিতর্ক করেন তা নয় আবার তার মুখের সামনে কেউ কটু কথা বলে তাও নয় তবে তাকে নিয়ে যে যথেষ্ট আলোচনা সমালোচনা চলে এটা ঠিক। আজ তাকে মসজিদে আসতে দেখে বেশিরভাগ মানুষ তাই ভীষণ অবাক হয়। যারা পরিচিত তারা বারবার তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে অপচরিচিতরাও বুঝতে পারে এই লোকটির মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে। নামায শেষ করে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করেন। তার হাতে হাত রেখে তওবা পড়েন। যত দ্রুত সম্ভব যার যা পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার ওয়াদা করেন। পরে শহিদ এ খবর শুনে তাকে একটা উপহার পাঠায়। একটা কুরআন শরীফ। সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

সমাপ্তি: ১৯/০৯/২০১৪ ইং

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!'' বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

* ভাষা শিক্ষা:

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ) ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)